বন্দোবস্তী

মহাশ্বেতা দেবী

করুণা প্রকাশনী | কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৫৯

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

লক্ষ্মী প্রেস

চন্দ্রশেখর চৌধুরী

১২ পটুয়াটোলা লেন

কলকাতা-৯

উৎসর্গ

রামলাল খাটুয়াদের,
যাঁরা আছেন
এবং
সোমদের,
যারা ওঁদের খুঁজছে ॥

ভূমিকা

এই বই ও "স্বেচ্ছাসৈনিক" পড়ার পর পাঠককে অনুরোধ করব আবদুল্লাহ রসুল রচিত "কৃষক সভার ইতিহাস" বইটি পড়ে নিতে। একটি উপন্যাস পড়ার জন্যে ওই বই পড়ব কেন, এমন প্রশ্ন পাঠকসমাজ তুলতেই পারেন। আমি নিজে লেখক যেমন, পাঠকও বটে। উপন্যাস পড়ে তার ইতিহাসের ব্যাপারটা জানতে চেয়ে আমি অনেক বই ই পড়তাম। "অরণ্যের অধিকার" পড়লে অন্তত কুমার সুরেশ সিংয়ের বইটি পড়বেন খুবই ইতিহাসে আগ্রহী পাঠক। "সিধু কানুর ডাকে" বা "তিতুমীর" বা "শালগিরার ডাকে" পড়ে যদি কেউ ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের "সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিবৃত্ত" বা "তিতুমীর জীবনী" পড়ে নেন, ইতিহাসটা পেয়ে যাবেন। কিন্তু অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি, কৃষকসভা, তেভাগা আন্দোলন, মন্বন্তর, এ সব বিষয় আমাকে বেশ কিছুদিন আগ্রহী করে রেখেছে। কৃষক ও জমিভূমি, খেতমজুর ও কৃষক, এবং সে বিষয়ে আদি পার্টির নীতি, এগুলি তো "অগ্নিগর্ভ" বইয়ে "অপারেশন ?—বসাই টুডু" লেখারও বিষয়—পশ্চাৎপট ছিল। "কৃষকসভার ইতিহাস" পড়ে নিলে আমার "অগ্নিগর্ভ" "স্বেচ্ছাসৈনিক," "ঘরে ফেরা," "অক্লান্ত কৌরব" "বন্দোবস্তী"-র ব্যাপারটা আরো তাৎপর্যময় প্রেক্ষিত পাবে বিশ্বাস করি। হয়তো এটা স্পষ্ট হবে, যে কম্যুনিস্ট পার্টির ডাকে তেভাগা আন্দোলনে ভাগচাষীর সংগ্রামে খেতমজুর (তেভাগার সাফল্য বা বর্গাদারীতে কোনো ঐহিক লাভ ছিল না) মরেছে, কিন্তু খেতমজুরদের বিষয়ে পার্টির কোনো নীতি বা উদ্বেগ কমই ছিল। হয়তো বোঝা যাবে, কৃষকসভা সম্মেলনগুলিতে যে সব কথা কৃষকের স্বার্থে বলা হোত, তার মধ্যেও অনেক ধোঁয়াশা ছিল, এবং প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বা সোচ্চার ঘোষণায় নেতারা যা বলেছেন, তা থেকে এখন পশ্চাদপসরণ করেছেন, করছেন কত দ্রুত। কৃষক আন্দোলনের মহান ঐতিহ্য পার্টির নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল তেভাগা অবধি, এবং পার্টি নীতির ফলেই সে আন্দোলন পিঠে ছুরি খায় কাকদ্বীপ ও তেলেঙ্গানায়, নকসালবাড়ি আন্দোলনেও। এই বইয়ে পড়ি নকসালবাড়ি প্রসঙ্গে, "যুক্তফ্রন্টের আমলের প্রথম দিকেই পশ্চিমবাংলায় কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা অনিষ্টকর ঘটনা ঘটে যায়।" (কৃষকসভার ইতিহাস—২৪০ পাতা) "প্রচারের ফলে নকসালবাড়ি বা নকসাল শব্দটা হঠকারিতার নামান্তর হয়ে পড়ে" (তদেব)। আজ এই সব নেতারা কি

বলবেন, যখন কৃষকের অধিকারের সংগ্রামই হয়ে গেছে আসমুদ্র হিমাচল ভারতে নকসালবাদী সংগ্রাম? এটাও তো দেখা যাচ্ছে কৃষকের অধিকারের সংগ্রাম নিয়ে যাঁরা লড়ছেন, রাষ্ট্রযন্ত্র তাঁদের বিষয়েই শঙ্কিত এবং "ব্যবস্থা" গ্রহণে তৎপর? আর কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি এ রাজ্যে অন্তর্দলীয় কলহে মরলে মরছেন। কিন্তু তাঁদেরকে বা তাঁদের মদত পুষ্ট কৃষক সংগঠন বিষয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র কিছু মাত্র ভাবিত নয়। রাষ্ট্রযন্ত্র জানে যে এরা এমন কিছু করবে না যাতে কায়েমী স্বার্থ চোট খায়। কাঁথি সম্মেলনে ১৯৬৯-এ ওই "হঠকারিতা" শব্দ ব্যবহার হয়। ওই সম্মেলন রিপোর্টে-ই লেখা আছে "কৃষক আন্দোলনকে প্রকৃত ভূমি-সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণত করবার জন্য, কৃষক সংগঠনকে বিপ্লবী চরিত্রের সংগঠনে পরিণত করবার জন্য, সেই আন্দোলন ও সংগঠনকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অগ্রসর করে নিয়ে যাবার জন্য কৃষকসভা ও তার কর্মীদের যোল আনা সুযোগ গ্রহণ করাই হবে এখন প্রধান কাজ।...সে জন্য চাই কর্মীদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গী, সংগ্রামী মনোভাব ও উদ্যোগ।" নকসালবাড়ি আন্দোলনের সূত্রপাতেও কি এই উদ্দেশ্য ছিল না? "প্রকৃত ভূমিসংস্কার" শব্দটি যদি ভারতে কোথাও প্রযুক্ত হোত, তাহলে তো ভূমিচিত্র বদলে যেত। নিরন্তর কৃষক, ক্ষেতমজুর, বিশেষ আদিবাসী এলাকায় জমি বা বাস্তু ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন বলেই তো গড়ে উঠেছে, উঠছে বৃহৎ শিল্প, মাঝারি শিল্প, জলাধার, বিদ্যুৎ প্রকল্প, ইত্যাদি। বস্তুত, ১৯৪০—আজ, এ সময়ের বাংলার ইতিহাসকে বুঝতে হলে (আমি চেষ্টা করছি মাত্র) কম্যুনিস্ট পার্টি, পার্টি বিভাজন, কম্যুনিস্ট পার্টি এম, এল, জমিভূমি, সাধারণ মানুষ, সৎ ও বিবেকী কর্মী (কালী সাঁতরা, ভোলানাথ দত্ত, মহানাম দত্ত), তৃণমূলের বার বার উচ্ছিন্ন মানুষ, এর সমগ্র চিত্রটা একটু একটু করে ধরার চেষ্টা করছি মাত্র। একটা কথা অনস্বীকার্য যে আজ আন্দোলন নেই, কিন্তু তৃণ মূলে হাহাকার বাড়ছে। এর কারণ কি?

রাষ্ট্রযন্ত্র কল্যাণমূলক আইন করছে, টাকা আসছে সমুদ্র সমান, কিন্তু যার জন্য দরকার, সে কতটা উপকৃত হচ্ছে তার মূল্যায়ন দিয়েই তো বিচার হবে সার্থকতা, ব্যর্থতা? ব্যর্থতার দিকে পাল্লা বড়ই ঝুঁকে পড়েছে, এ কথা অনস্বীকার্য। শুধু কি আদিবাসীরা বঞ্চিত হন? ৮৬-৮৭, ৮৭-৮৮, দুই বছরে নিম্নবিত্তের আবাসনের জন্য ২২ কোটি করে টাকা আসে যার ১৩।১৪ কোটি দু'বছরই কেন্দ্রে ফেরত চলে গেল।

—রাষ্ট্রযন্ত্র জানে, সব বেকারকে চাকরি দেওয়া যাবে না। সে জন্য স্কীম-

ব্যাঙ্ক ঋণ মাধ্যমে সব বেকারদেরই স্বয়ম্ভর হবার ব্যবস্থা আছে। কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ, কতজন উপকার পেয়েছেন? পানীয় জল? ১৯৮৩—১৯৮৮ পুরুলিয়ার আদিবাসী এলাকায় (আদিবাসী এলাকা তাকেই বলা হয় যেখানে ৪০% থেকে কিছু বেশি আদিবাসী থাকেন অন্যান্য জাতির সঙ্গে) দেখছি গরীব মেয়েরা শুকনো নদীর বালি খুঁড়ছেন জলের জন্য। এ কথা নির্মম সত্য, যে কোটি কোটি টাকা এ বছর পশ্চিমবঙ্গে শুকনো জেলাগুলিতে এসেছে, প্রতি বছরই এ খাতে রাজ্যসরকার মোটা টাকা খরচ করেন। (১) পঞ্চায়েত প্রধান মন্ত্রীর চেয়ে ক্ষমতাধর; (২) টিউবওয়েল, কুয়ো হয় ক্ষমতাশালীদের পাড়ায়; (৩) টিউবওয়েল, কুয়ো, বা পুকুর তৈরিতে পুকুর চুরি চলে। যাঁদের জন্য ব্যবস্থা, সরকারী ভাষায় তাঁরা "টার্গেট বেনিফিসিয়ারি," আর পুলিশেরও "টার্গেট" থাকে। ওদের চোরডাকাত বলে ধরো জমিভূমির ব্যাপারে দুর্বলকে হয়রান করো, এই চলে। আবার এটাও অকাট্য সত্য, গ্রামে এক গ্রামবাসী নতুন কুলাক শ্রেণী গজিয়ে উঠেছে। মোপেড, পাকা বাড়ি, ব্যবসা, জমিজমা, সব তাদের আছে। সাচ্ছল্যের এক চিত্র গ্রামেও আছে। তবে সে সচ্ছলতা কার, কেমন করে হোল, সে বিষয়ে নীরব থাকাই চলছে। কেউটের লেজ ধরে কেউ কি কান চুলকোয়?

এ রকম হোল কেন? মানুষ ভূমিহীন হচ্ছে, পাট্টা জমি পেলেও রাখতে পারছে না, গ্রাম ও শহরে কাজ নেই, মেয়েদের অবস্থা সব চেয়ে শোচনীয়, ছোট খোকা ছোট খুকি অ-আ পড়ার সময় পায় না, শিশু শ্রমিক হয়ে যায়, শিশুদের শৈশবই নেই?

হোল, কেন না এটাই রাষ্ট্রযন্ত্রের অভিপ্রায় ছিল। জমিভূমি দারিদ্র্য মোচন, সবই একটা অচল দুর্গের বাইরে পলেস্তারা। অচল দুর্গটা হোল চিরকালের কায়েমী স্বার্থ। আজ সে কায়েমী স্বার্থের চেহারাও পালটে যাচ্ছে। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ঠিকাদার, নব নব রূপে কায়েমী স্বার্থ বিরাজিত।

আন্দোলনের কারণগুলি কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে থেকেই গেল, বাড়ল, কিন্তু আন্দোলন বন্ধ। অনেক অনেক দিন ধরে সুস্থ গণতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ। নারী নির্যাতন, পণপ্রথা, মূল্য বৃদ্ধি, কালোবাজারী, ভেজাল কারবার, অনিষ্টকারী ঔষধ, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদীদের দাপট, এ সবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন কোথায়? কারখানা মালিক ও ট্রেডইউনিয়ান ব্যবসায়ী নেতাদের যুক্ত আঁতাতে কলকারখানা বন্ধের বিরুদ্ধে নেতারা মৌন কেন?

স্রোত হারালে নদীর জল বদ্ধ ও দূষিত হয়। আন্দোলন না থাকলে

দূষণ। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও তাই, আর এ প্রসঙ্গেই আমি একটা গোদা সত্য (আমার উপলব্ধি) বলব। সেটাই এ বইয়ের মূলকথা। গ্রাম থেকে আমরা শ্রমিক, কাজের লোক, চাল-সবজি-মাছ থেকে শুরু করে সব নিই। গ্রামকে দিই না বিদ্যুৎ, পানীয় জল, রাস্তা, শিক্ষার উপায়, কর্ম সংস্থানের উপায়, মেয়েদের স্বাবলম্বী হবার উপায়। গ্রাম যেন "স্তনদায়িনী" যশোদা। সে সকলকে বাঁচায়, তাকে বাঁচায় না কেউ। গ্রামসমাজে যে স্বার্থসন্ধী ক্ষমতাশালী নয়া শ্রেণী গড়ে উঠেছে, রাষ্ট্রযন্ত্রের কল্যাণব্যবস্থা সেই ভোগ করছে। পঞ্চায়েত গঠনের উদ্দেশ্য তো ভালো, কিন্তু এখনো পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় তৃণমূল বৃহদর্থে উপকার পায় নি। পঞ্চায়েতগুলি অ—হ সকল দলের ক্ষমতার কেল্লা তৈরি হয়েছে। আমি জানি, ইতিহাসের শ্রেণী সংঘর্ষের নিয়মে এ চিত্রও বদলাবে, বর্তমানে যা হয় নি। এটাও বুঝে পাইনি, পঞ্চায়েত মাধ্যমে সব কাজ হবে, সেচ, শিক্ষা, বনসৃজন, ইনকাম জেনারেটিং স্কীম, অথচ যাঁরা করবেন, সেই পঞ্চায়েতকে প্রশিক্ষণ দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই। অন্তত পূর্ত, সেচ, কৃষি, এ সব বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ বিষয়ে সহযোগিতা করার প্রশিক্ষণ তো দরকার।

এ রকম অনেক কথাই বলা যায়। যে কথা গ্রাম বিষয়ে উপরে বলেছি সে কথা গ্রামীণ সংস্কৃতি বিষয়েও সত্য। এবং এখানে একটি রূঢ় সত্যও বলা যায়। গ্রামীণ শিল্প গ্রহণে শহর প্রস্তুত। তার রপ্তানি ও বিক্রয় মূল্য আছে। কিন্তু যে সব শিল্প অজানিত, অবহেলিত সে বিষয়ে শহর আগ্রহী নয়। মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির মূলেই গলদ। গ্রামীণ সংস্কৃতি বিষয়ে এই গলদের মূলে ফিরে যাই। গ্রামজীবনের সঙ্গে সংস্কৃতি-শিল্পের ব্যাপারটা জড়িত। যে মাটির হাতি, ঘোড়া শহরের দোকানে দেখি, তা গ্রামের মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, গাছ তখন দেবতা, বৃক্ষমূলে ওগুলি তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার নিবেদন। আর যে সব ঘটনা গ্রামজীবনকে প্রভাবিত করে তাও তাঁরা গান-পাঁচালী—গীত কথায় বেঁধে রাখেন চিরকাল। "একবার বিদায় দে মা" গান মনে করুন। বান, ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, খরা, মন্বন্তর, সাঁওতাল বিদ্রোহ, আগস্ট আন্দোলন, তেভাগা, এ সব নিয়েই তাঁরা গানে গানে ইতিহাসকে ধরে রাখতেন।

এই গ্রামীণ সংস্কৃতিকে প্রকৃত সম্মানে গ্রহণ করা হয় নি, বাঁচিয়ে রাখা হয় নি। আসল গণসংগীতকে কোনো দাম দেয়া হয় নি। সিনথেটিকের যুগে সিনেমায় সিনথেটিক আদিবাসী, ব্যাপক শ্রোতার জন্য সিনথেটিক গণসংগীত ও

পল্লীগীতি, এগুলো পেয়েছে অবাধ ছাড়। এ বিষয়ে অন্তত কম্যুনিস্ট পার্টি-গুলির নৈতিক দায়িত্ব ছিল। আজও তো তাঁদের সংস্কৃতি-নীতি এ বিষয়ে উদাসীন। অথচ রসুলের বইয়ে দেখছি ১৯৪৪ সালে ফুলবাড়ি বন্দর সম্মেলনে, "এই সময়ে বাংলার অনেক জেলাতেই (মনে রাখবেন, মন্বন্তর হয়েছে, যুদ্ধ চলছে, দিনাজপুরে জোতদার-জমিদারের অনেক বাজে আদায় বন্ধ হয়েছে কৃষক আন্দোলনের ফলে এই সময়ের মধ্যে) কৃষক আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে সংগীত, জননাট্য, নাচ, গান প্রকৃতি কৃষ্টিমূলক কাজ গড়িয়া উঠিতেছে।......এই কাজে কৃষকসমিতিগুলিকে অগ্রণী হইতে হইবে এবং কৃষক সমিতির নিজস্ব তদারকে এই কৃষ্টি বাহিনীর সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। কৃষকদের মধ্যে ও গ্রামে, প্রচলিত নাচ গান পরিবর্ধিত ও সংশোধিত করিয়া বা নূতন ভাবে রচনা করিয়া প্রধানত কৃষকদের বা গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে শিল্পী সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দ্বারা কৃষি বাহিনীকে সংগঠিত করিতে পারিলেই প্রকৃত ভাবে উহা কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী করিবার পক্ষে উপযোগী হইবে। (সাংগঠনিক পত্র=১. ৬. ১৯৪৪)।

দেখা যাচ্ছে সেদিন কম্যুনিস্ট পার্টি একটু বুঝেছিল। আন্দোলন, কম্যুনিস্ট পার্টি, এ সব কথা বাদই দিলাম। গ্রামীণ সংস্কৃতি বিষয়েও আমাদের জ্ঞান নেই, শ্রদ্ধা নেই। তাই এক বিশাল মহাদেশ, যা দেশজ, তাতে কি ছিল, আরো কত সমৃদ্ধ করা যেত, না ভেবেই আমরা সেই মহান সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে মেরে এনেছি। পটুয়া, গায়ক, ছো শিল্পী, এমন হাজার হাজার ধারার সংস্কৃতি-জীবী মানুষরা এবং তাঁদের সংস্কৃতি গ্রামেই যাতে বেঁচে থাকে সেটাই দেখা দরকার ছিল।

তা তো হোল না।

অন্নাভাবে শিল্পী মরছেন, সংস্কৃতি মরে যাচ্ছে।

আর গ্রামবাংলায় অপসংস্কৃতির বন্যা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে দেশজ সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করে। ভি. ডি. ও. পার্লার, ক্যাসেটে হিন্দী গান, কুৎসিত হিন্দী ছবি, সিনথেটিক গণসংগীত, কি নেই!

দেশ-দেশজ সংস্কৃতি-গ্রামীণ শিল্পী!

"বন্দোবস্তী" চলছে এখন, রাষ্ট্রযন্ত্র যা চায়। মানুষ ভাবছে সে স্বাধীন মতে কাজ করছে। তা তো নয়, রাষ্ট্রযন্ত্র পিছন থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বলে দিচ্ছে, জীবন একটা বন্দোবস্তী বা অ্যারেঞ্জমেন্ট মাত্র। যে যার শ্রেণীস্বার্থের কথা ভাবো। ভোগবাদী মূল্যবোধ ঢুকে যাক মাটির গভীরে। যা সুস্থ, যা

দেশজ, যা দেশ, যা মানুষ, তাকে শুকিয়ে মারো। অথচ এমন সংকটকালেও দেশ ও মানুষকে বাঁচাতে পারে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, নিরন্তর আত্মত্যাগ।

আছে, তেমন মানুষ আছে। ভোলানাথ, লেঠেল রাম, গজানন, কালীপদ, রামলাল, এঁদের আমি দেখেছি, জানি। ওই জনপদও জানি পায়ে হেঁটে।

সোমরাও আছে।

তাদেরও দেখি।

আশা তাই বেঁচে থাকে। সাধারণ মানুষের নিরন্তর সান্নিধ্য, তাদের শ্রদ্ধা করে কাছে গিয়ে দাঁড়ানো, দুঃখীর দুঃখমোচনের চেষ্টা (ফল তো হাতে নেই)। এছাড়া আজকের প্রজন্মের বেঁচে থাকার অন্য কোনো পথ নেই। "বন্দোবস্তী" সে কথাই বলছে। আমি তো বিশ্বাস করি নিরন্তর বীজ ছিটানোতে। সব বীজ তো বালিতে পড়ে না। যখন মাটিতে পড়ে, অঙ্কুর ওঠে।

মহাশ্বেতা দেবী

॥ ১ ॥

গণকবিয়াল রামলাল খাটুয়ার নাম সোম কোনদিন জানতে পারত না, জানার কথাও নয়। রামলাল খাটুয়ার মতো কত গণকবিয়াল মরে গেছে, কে কার খবর রাখে।

সোমের নিজের জীবনে তখন খুব বিপর্যয়। অনেকদিন ধরেই সোম কোথাও বাঁধাধরা কাজ করে নি। রিসার্চের কাজে আগ্রহ ছিল বলেই ও যোগ দেয় একটি প্রতিষ্ঠানে, যার নাম "সার্চ"। সার্চের সার্চলাইট ছিলেন মুকুল দত্ত, যিনি বাঘের মতো কাজ করতেন ও করিয়ে নিতেন বলে আপিসে নাম ছিল মুকুল বাঘ।

"সার্চ" প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ডেকেছিল।

বিষয়, শিশু শ্রমিক।

সোমের লেখাটা ওঁর মনে খুব ধরে। তারপর উনি কলকাতায় এসে ওকে ডেকে পাঠান। সার্চ, আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান। নানা বিষয়ে বিশদ সমীক্ষা তৈরি ও সার্চ বুলেটিনে প্রকাশ তার একটা কাজ। আবার এই সব সমীক্ষার পর সরকার কখনো কখনো নীতি গ্রহণ করে, কল্যাণকারী আইন পাস করে।

সোমের বয়স তখন কম, নিদারুণ এনথু, তাছাড়া ও বিশ্বাস করেছিল এতদ্বারা, অর্থাৎ এই ধরনের কাজকর্ম করলে তা হবে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কাজ।

ওর বউ জয়ি বলেছিল, সে আবার কি? তুমি মাইনে নেবে, টি. এ. পাবে, তোমার লেখা বেরোবে, এর মধ্যে জনগণের কথা উঠছে কোথা থেকে? তা করতে চাও, রাজনীতিতে নেমে যাও।

—না, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—সাহসই নেই তোমার!

সোমেরও সাহস নেই, রাজনীতিও তেমন নেই। সোমের বাবা ছিলেন অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মী। ওঁর না কি ইচ্ছে ছিল

শান্তিলতাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তখন পার্টি থেকে খুবই নজর রাখা হত।

শান্তিলতার বাবা কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা। শান্তিলতা বিদ্রোহ করে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু তবু তাঁর পরিবারের ওপর প্রবল টান। বিয়ের পক্ষে তিনি······

সোমের বাবা, ওর মাকে বিয়ে করেন। কম্যুনিস্ট পরিবারের মেয়ে, কিন্তু মনে মনে খুব সংসারী, অরাজনীতিক।

সেই শান্তিলতা শেষ অবধি অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টিতে সর্বক্ষণের কর্মী হন। পার্টি ভাঙার পর গড়ে তোলেন একটি গরিব মেয়েদের তাঁত শেখার সেণ্টার হুগলীর সোনাদান গ্রামে। সরকারী সাহায্য নিয়ে সেটিকে দাঁড় করান এবং এই সেদিন মারা গেছেন। বিয়েও করেছিলেন পার্টিকর্মীকে, বিধবা হন। শান্তিলতা কোনোদিন যোগাযোগ করেন নি, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণায় সোমের বাবার নাম দেখে সোমের মা রীতিমতো ক্ষেপে উঠেছিলেন।

সোমের বাবার রাজনীতি করা, সে জন্যে দারিদ্র্যে থাকা, এসবে সোমের মার অবিশ্বাস ছিল। আবার সোমের বাবা যখন মারা যান, সেই পঞ্চাশের দশকে রাজনীতি এমন লাভজনক কারবারও হয় নি। কম্যুনিস্টরা আন্দোলন করত, এ রাজ্যে জিতত কংগ্রেস।

সোমের মা সেজন্যেই ওর কাছে কখনো বাবার কথা সগৌরবে বলেন নি। যদিও বাবার জন্যেই মা স্কুলে চাকরি ও সি. আই. টি.-তে ছোট ফ্ল্যাটটি পান। কংগ্রেসীরা বিরোধীদলের লোকদের হরদম ফ্ল্যাট দিত। সে ট্রাডিশন এখন আর চলে না।

যাই হোক, সোম বড় হল বাবা কিংবা তাঁর রাজনীতি কি, কিছুই না জেনে। বাবা তো একটা ছবি। তিন বছর বয়সে বাবা মরে গেলে সোম কেমন করে তাঁকে মনে রাখবে?

এ দেশ মাতৃপূজার দেশ। ব্যাপারটা বেশ মজার। মেয়েদের এ সমাজ কোনো সম্মান দেয় না, কিন্তু "মা" ব্যাপারটি সুকৌশলে বাঁচিয়ে রাখে।

সোম জানে, বাবা যার নেই, সে ছেলে মনে কেমন নিরাপত্তাহীন, অসহায়। ছোটবেলা তো একজন হিরো দরকার। যতদিন ছেলে বেশ ছোট, বাবাই তার কাছে নায়ক।

মার মনে কোথায় একটা চাপা রাগ ছিল। কম্যুনিস্ট হতে না গেলে তাঁর স্বামীও কাজকর্ম করতেন, বউ ছেলেকে দেখতেন, হয়তো আরো বাঁচতেন।

সোমকে উনি বোঝাতেন, কম্যুনিস্ট রাজনীতি কিছু নয় সোম। লেখাপড়া করো, চাকরি করো, এ জীবন অনেক ভালো।

আগে বাংলা স্কুল, তারপর সেণ্ট জেভিয়ার্স, সোম বড় হয়ে গেল। অতীতকে জানল না, নিজের সময়কেও জানল না।

অতীত, ওর মৃত পিতা, এ সব বিষয়ে ও কোনোদিন কিছু জানতে পারত না, রাম সেন নামে এক খটখটে প্রৌঢ় যদি ওদের বাড়িতে না আসতেন।

সময় ১৯৫৪।

সোমের বয়স সাত।

—তুমি আমাগো অশোকের পোলা ?

—হ্যাঁ।

—মা কোথায় ?

—বাজারে গেছেন।

—বসি একটু ! লও, জামরুল খাও। আমারে চিন ?

—না তো ?

—আমি তোমার এক জ্যেঠা। তোমার বাবা আমারে দাদা বলত, মা আমারে দাদা বলত।

—আপনি আমার বাবাকে চিনতেন ?

—খুব।

এ সময়ে মা এসে পড়েছিলেন।

—এই যে বউমা !

—আপনি ? এতকাল বাদে ?

—হ্গলই জানি রে মা! খালাস তো হইলাম গত বছর। অহন আমাগো কমরেডদের খবর লই, যোগাযোগ করি……

—চা তো খাবেন।

—না, খাইয়া আইছি। অহন তোমাগো খবর…

সোমের মা সোমকে বলেন, বাজারটা রেখে আয়।

তারপর কি যে বলেন রাম সেনকে, রাম সেন মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যান। যাবার কালে বলে যান, রাগ দুঃখ কার পরে করতেছ মা? মানুষটা নাই। তুমি যতই বলো মা, আমি আসুম!

কখনো ডাঁটা, কখনো কাঁঠাল, কখনো সজনে ফুল, রাম সেন কখনো খালি হাতে আসতেন না।

ওঁর কাছেই সোম বাবার কথা সামান্য শুনেছে। মা থাকলে প্রসঙ্গটি উঠতেই দিতেন না।

—সে সব কথা যাক! লাভ নেই।

সোমের মনে কৌতূহল এক সময়ে ছিল।

পরে আর থাকে নি।

অসীম উৎসাহে সোম সার্চের হয়ে কাজ করতে নেমে যায়। তখনো ও ছিল খুব আনকোরা, কোনো উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করতে চাইত। বাবার কম্যুনিস্ট পার্টির "কজ" ওর কাছে বাস্তব ছিল না। কেননা মা ওকে সে সব জানতে দেন নি।

রাজনীতিক পশ্চিমবঙ্গে অরাজনীতিক শহুরে যুবক হবার একটা ব্যাপার আছে। যদি তোমার লক্ষ্য থাকে কেরিয়ার, তুমি পড়া শেষ করলে, পরীক্ষায় বসলে, ইনটারভিউ দিলে, একই সঙ্গে বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে, তারপর চলে গেলে কেরিয়ারে।

সোমদের অন্য সমস্যা। ওরা কেরিয়ারিস্ট হতে চায় নি, মনে করেছে কোনো "কজ" থাকলে ভাল হত। আবার অরাজনীতিক

থেকে বড় হবার জন্যে কোনো "কজ"কে করতে পারেনি আপন। যারা আদর্শ নিয়ে রাজনীতি করে তাদের দূর থেকে শ্রদ্ধা করেছে আর মাঝে মাঝেই মনে কি তীব্র হাহাকার, আমি এক অসম্পূর্ণ মানুষ।

এমন ছেলেরাই একটি সমীক্ষার কাজে লিপ্ত থেকে টাকা রোজগার করার সঙ্গে সঙ্গে "তবু কিছু কাজের কাজ করছি" এ সান্ত্বনা পায়। জীবন তাহলে নয় অপচিত, উৎসবের পর ফেলে দেওয়া ফুল ও মালা, নির্বাচনের পরে ছিঁড়ে ফেলা ইস্তাহার।

গভীর বিশ্বাসে সোম দিল্লীর সার্চের নির্দেশে গিয়েছিল ভারত ভুটান সীমান্তে জলপাইগুড়ির টোটো বসতিতে। বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত সাতশো খানেক টোটোদের বিষয়ে বহু পরিকল্পনা, বহু টাকা বরাদ্দ।

তারপর দেখেছিল টোটোদের নামে রেকর্ডেড জমি, "আদিবাসী জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ" আইনকে কলা দেখিয়ে ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ জমি অন্য জাতি নিয়ে নিয়েছে।

জলপাইগুড়ি বনবিভাগ দখল করে আছে সিংহভাগ।

একশো চুয়াল্লিশটি টোটো পরিবার।

ষাটটি পরিবারের দখলে দুশো ছেষট্টি একর।

চুরাশিটি পরিবারের দখলে একাশি একর।

টোটোরা মরে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে।

যোজনা থেকে যোজনা টাকা বাড়ছে।

টোটোরা জানে তারা মরে যাবে।

তখন বয়স কম, প্রচুর এন্‌থু, এবং কাণ্ডকারখানা দেখে রক্ত গরম। সাহিত্য করার সুপ্ত বাসনাও কি ছিল না ?

তাহলে ওর রিপোর্টে কেন জুড়ে দেবে বন্ধুর কবিতা—

"বিপ্লব গেছে নেতাদের খোঁজে
যুবকেরা গেছে উৎসবে
যুবতীরা গেছে বিশিষ্ট ভোজে
গরিবের হায় কি হবে ?"

এই রিপোর্ট সার্চের চকচকে কাগজে ঝকঝকে ছাপা হয়। মুকুল বাঘ সোমকে অভিনন্দন জানান।

—এতে কোনো কাজ হবে ?

—কি কাজ ?

—ওই ম্যাজিস্ট্রেটের লেখা প্ল্যানটা তো টোটোদের বাঁচানোর সব চেয়ে কার্যকরী প্ল্যান।

—এবং সে প্ল্যানটি···

—লালবাড়িতে ধামা চাপা।

—একাত্তরের সেনসাসে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৪,৪৩,১২,০১১ এবং আদিবাসী জনসংখ্যা ২৫,৩২,৯৬৯।

—তাতে কি ?

মুকুল তাঁর মাথার চুল টেনে টেনে ছেড়ে দিচ্ছিলেন। পেশল শক্ত শরীর। বয়সে প্রৌঢ়, মুখে হাজারটা রেখা, ঠোঁটে স্মিত হাসি। বড্ড জোরে গাড়ি চালাতেন, যেন মোটর রেসে নেমেছেন। গাড়ি চালাতে গিয়েই একটি ট্রাকে ধাক্কা লেগে ত্রিবান্দ্রমের কাছে কোথাও মারা যান। সোম শুনেছে ওঁর স্ত্রী বম্বেতে থাকেন, মেয়ের কাছে।

মুকুল একটু হেসে বললেন, ওই পঁচিশ লক্ষের মধ্যে সাতশো না কত টোটো যদি না থাকে, থাকবে না।

—এ আপনি কি বলছেন ?

—হিসেব নিয়ে দেখ, এমন কত ছোট ছোট আদিম মানবগোষ্ঠী শুধু আধুনিক সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলতে পারেনি বলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, ওরাও হয়তো যাবে।

—ওরা তো "আধুনিক সময়ের সঙ্গে চলতে পারে নি" বলে বিলুপ্ত হবে না। সরকার ওদের অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

—তাই তো দেয়। তোমার সরকার আসলে তো স্থবির। অপদার্থ, না সমাজতান্ত্রিক, না ধনতান্ত্রিক, সে শুধু নামে গণতান্ত্রিক! ওটা হয়তো সরকারের নীতি।

—ঘোষিত নীতি তবে অন্য রকম কেন?

—সোম! সামনে তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। লেখার কথা,—লিখেছ। ছাপার কথা,—ছাপা হবে। কিন্তু নিজে ওর মধ্যে জড়িয়ে যেও না, নির্মোহ হও।

—কাজের কাজ যদি নাই হয়, লিখে লাভ?

—হবে। অ্যাকাডেমিকরা পড়বে, রিসার্চ ইনস্টিটিউশনগুলো পড়বে, সরকারের ঘরেও যাবে।

—এটা কেমন লাগছে!

মুকুল তাঁর কলম দিয়ে সোমকে টোকা দিলেন, যেন চাকু বসাচ্ছেন। বললেন, সাংবাদিকদের দেখ। আজ কলিয়ারির দুর্ঘটনা লিখে কাঁদাবে, কাল চিত্রতারকার গোপন সংবাদ লিখে সুড়সুড়ি দেবে, পরশু গাছ ও পরিবেশ নিয়ে · তাকে নির্মোহ হতে হয়। যা লেখে তাতে সে নিজেকে জড়ায় না।

—গোটা লেখাটা ছাপবেন?

—অবশ্যই।

—এবার কি?

—ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, কয়েকটা জায়গায় যাবে, নমুনা সমীক্ষা করবে। বিষয়, দারিদ্র্য সীমার নিচের মানুষদের খাদ্য অভ্যাস।

—ওদের সমস্যা খাদ্য পাওয়া, তাই নয়?

—তাই। কিন্তু সমীক্ষক তা ভাববে না।

সেই সমীক্ষা, সেই সমীক্ষা! কি অভিজ্ঞতা সোমের! সময়টাও ছিল খরার সময়, বিহার ও ওড়িশায় অজন্মা চলছিল। মধ্যপ্রদেশে ওরা যায় গাটিয়াতে। সার্চের ব্যবস্থায় ওরা ব্লকের ডাকবাংলোতেই ছিল। গাঢ়িয়া ভারতবর্ষে সর্বত্র আদিবাসী এলাকায় আজও যা চলছে, ঠিক তাই।

সোম, একটি অবাস্তব দিনের পর ডাকবাংলায় ফিরে "চিকেন খানা" দেখে টেবিলেই বমি করে, বালকের মতো কাঁদে, এবং পরদিনই মুকুলকে চিঠি লেখে।

ও লিখেছিল, "বিগত এগারো বছরে এই দুর্গম অঞ্চলে আদিবাসী উন্নয়নে যত টাকা এসেছে, সব দিয়ে রাস্তা হয়েছে, বাংলা হয়েছে বিভিন্ন দপ্তরে। এখন বিশ্বাস করি ভারতবর্ষে সর্বত্র এ রকম হচ্ছে। কেন না আদিবাসী জানে না তাকে সরকার কি দিচ্ছে। শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন জানতে পারে। আমার সহপাঠী বিজয় মুর্মু যেমন জানত। কিন্তু ওদের কোনো ভয়েস নেই।

গাড়িয়া অঞ্চলে বাস করে পাঁচ হাজার সাতশো নব্বই আদিবাসী। সতেরো জন প্রাথমিক স্কুলে গিয়েছিল, ছেড়ে দেয়। এখানকার মাটিতে চাষ হয় না, সেচ নেই। একটিও নলকূপ নেই। আছে শুধু পাকা রাস্তা। ওরা যে জনার জাতীয় শস্য চাষ করে ওরই মধ্যে, তা তুলে নিতে মহাজনের ট্রাক আসে।

ব্লক অফিসার, "খরা" বলতে নারাজ, কেন না ভূপাল এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি, নির্দেশ জানায় নি।

শহরে এসে ওরা শিশু বেচে যাচ্ছে, ফেলে যাচ্ছে। ঝর্ণাগুলিতেও জল কমে এসেছে।

আমি ছয় ঘণ্টা ছিলাম।

ওরা সেই সব কন্দ খুঁজছে যা খেতে বুনো শুওরও ভয় পায়। ওই কন্দ খুবই তেতো ও ঝাঁঝালো।

আমি দেখেছি ওরা মৃত শিশুদের কবর দিচ্ছে। দেখলাম বাসো নামে এক বৃদ্ধা ঘরের সামনে বসে মরে গেছে।

ওদের খাদ্য অভ্যাস বিষয়ে লিখতে পারলাম না, ক্ষমা করবেন। আমি পালিয়ে যাচ্ছি। নির্মোহ হতেও পারলাম না। ব্লক অফিসারকে দিয়ে "রিলিফ জরুরি" বলে তার পাঠাতে পারলাম না ভূপালে। লোকটি খুব বিমর্ষ। ও আমাকে পরিষ্কার বলল, এটা তো দু'বছর দেখছি। আগের অফিসারও লিখে গেছে যে গাড়িয়াতে

খরা, অজন্মা স্বাভাবিক নিয়মে চলে। শিশু বিক্রি হয়। একই বাপ-মা দু'বছর অন্তর অন্তর শিশু বেচে যায়।

সার, ওপরের শেষ লাইনটা খুব বিপজ্জনক। "একই বাপ মা বছর বছর শিশু বেচে যায়!" রিপোর্টে এ লাইনটাও লিখতে হত বলেও আমি কাজটা করছি না।

লাইনটা অতি ভয়ংকর।

এই একটা লাইন বহু জনকে উড়িয়ে আনবে গাঢ়োয়াতে। অনেক রকম সংস্থা, অনেক "অন্যায় প্রতিকারে ব্যগ্র" মানুষ, অনেক "নৃতাত্ত্বিক + সমাজমনস্তাত্ত্বিক + ইত্যাদি ইত্যাদি" অ্যাকাডেমিসিয়ান।

অতীব ভয়ানক কথা হল বাসোর ছেলে রাকসা দুর্বোধ্য আনন্দে হাসছে ও বলছে, লিখে দাও সায়েব। একবার গাঢ়িয়াতে গাড়ি চেপে মানুষ আসুক।

ওকে ব্লকে এনেছি, ভাত খাইয়েছি।

যারা আসত আমি তাদের হাতে ওই ছাপানো লাইনটা "একই বাপ মা বছব বছর বা দু'বছর অন্তর অন্তর শিশু বেচে যায়" তুলে দিতে চাই না।

কেন না লাইনটি যে কত রকম গবেষক, সাংবাদিক ও অন্য জনগণকে এনে ফেলবে! ,

কত দিক থেকে লাইনটির ওপর হামলা আসবে, কত বার লাইনটির শবব্যবচ্ছেদ হবে।

—এই সব আদিবাসী বাপ মার কি শিশু জন্মদান ও বিক্রি বিষয়ে কোনো মানবিক অনুভূতি নেই? এদের "জিন্"-এ কি কোনো গণ্ডগোল আছে? মস্তিষ্কে সব সেল নেই? এ নিয়ে বিশদ গবেষণা দরকার।

—কত বছর ধরে জায়গাটি "ফেমিন কনডিশানে" আছে? কেন আছে? আদিবাসী বিভাগ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধীন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কি জবাব দেবেন? এর তদন্তমূলক অন্তর্দন্তা সমীক্ষা চাই। ব্যাপক জনমত গঠনে···

—নৃতাত্ত্বিক + সমাজ— নৃতাত্ত্বিক + আদিবাসী—সমাজমনস্তাত্ত্বিক অ্যাকাডেমিক গবেষণা দ্বারাই বোঝা যাবে। ওরা কেন মাড়োয়া বা জনার চাষ করে। ফসল তো মহাজনই নিয়ে যায়। এবং কেন ওরা অখাদ্য কন্দ খায়, এটা খাদ্যাভাব নয়। এর পিছনে আছে আদিম খাদ্যাভ্যাস। কেন ওরা যৌনানন্দের দিকে ধাবিত। তা বোঝা যাবে ওদের যৌনজীবন নিয়ে গবেষণা করলে।

গোদা কথা সার, গাড়িয়াতে বারো মাস আকাল। জীপ থেকে নেমে আমরা রুক্ষ পাথুরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠছি, উঠছি, পাথরের ফাটলে শুকনো ঘাস ও আগাছা। ঢাল বেয়ে উঠে আবার ঢাল বেয়ে নামি। জ্বলে যাওয়া খারা গাছ, শুকনো ঝাঁটি জঙ্গল, বললাম, ওগুলো কি ঘাস? অমন অদ্ভুত দেখতে? যেন বড় বড় টোকা।

ব্লক করমচারী বলল, ওদের বস্তি।

হ্যাঁ, মুখ থুবড়ে থাকা ঘর। ঘাসের চাল। আরেকটু এগিয়ে গাড়িয়া ঝোরায় দেখেছিলাম। এখানে ওখানে মাড়োয়া বা জনার চাষের চিহ্ন। নলকূপ নেই, কুয়ো নেই।

করমচারী বলল, বৃষ্টি হচ্ছে না। জল পড়লে সব সবুজ হয়ে যায়। ঝোরা দিয়ে জল নামে তোড়ে। সে সময়ে টাউন থেকে বাবুরা আসে পিকনিক করতে, অফিসাররা আসে।

আমি এখানে বসে ভূপালে, মহকুমায়, সর্বত্র টেলিগ্রাম পাঠালাম। কোনো কাজ হবে না। আপনি পারলে খবরের কাগজের লোক পাঠান। সরকার ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে।

রাকসা দু'বার দুটো ছেলে মেয়ে বেচেছে।

কেনার মানুষেরা ঠিক আসে ফি-বছর।

এ সব আদিবাসী শিশু চামচিকের মতো, পেটে পিঠে এক, রং ঘোর কালো, বাপমায়ের অপুষ্টি, কঙ্কালসার মায়ের পেটে বড় হওয়া, ওরা কাঁদে না সার।

রাকসার বক্তব্য, মিশন যতদিন আসত, ওরা খেতে পেত, ওষুধ

ও সুঁই পেত। করমচারী তাদের আসতে নিষেধ করে দিয়েছে। করমচারীর সামনেই এ সব কথা হয়, করমচারী রাকসাকে একটি বিড়ি দিয়ে চলে গেল ও বলে গেল, শহরের বাবুকে বলে যা। তারপর তোরা থাকবি ও আমরা থাকব।

করমচারী মিশনকে বাধা দিতে পারে না, তার সে এক্তিয়ার নেই। কিন্তু গাঢ়িয়া আদিবাসী বস্তিতে সেই হল "সরকার"। গাঢ়িয়া পৌঁছবার পাথরের ফাটলে বিষাক্ত বিছে থাকে। সরকারী লোকজনের কাছে গাঢ়িয়া খুবই দুর্গম গিরি কান্তার মরু এবং কেউই ওখানে যায় না, এমন কি "স্বাস্থ্যকর্মী"ও নয় এবং ১৯৬১ আদমসুমারি কালে গাঢ়িয়া বাদ পড়ে যেত যদি না ঝর্ণার ধাবে বাবুরা বনশোভা দেখতে যেত।

এসব শিশুদের কারা কিনবে সার? কেন কিনবে? এই ছেলেরা বড় হলে কালো পাথরে তৈরি আদিম ব্যাধের মতো দেখতে হবে না, মেয়েরা হবে না কৃষ্ণা দ্রৌপদী।

রাকসা করমচারীর সামনে কথাটা বলল কেন?

ভয় হারিয়ে ও মরিয়া হয়েছে দুঃসাহসে?

না, এটা হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ?

এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি ওদের খাদ্য অভ্যাসকে আপনার নির্দেশ মতো নির্মোহ চোখে সমীক্ষা করতে পারছি না। এখন আমাকে নিয়ে আমিই মনে মনে একটা কার্টুন আঁকলাম। আমি মাইক্রোসকোপে চোখ রেখে বসে আছি। "অনাহারে মৃত্যু" শব্দটি কয়েকটি কঙ্কালের মতো মানুষের মৃতদেহ দিয়ে সাজানো, অতীব ক্ষুদ্র সে হরফ। নিচে আমার প্রশ্ন, মৃত্যুর কারণ কি আদিম খাদ্যাভ্যাস?

বুঝতেই পারছেন আপনার কাজের পক্ষে কত অযোগ্য আমি। এর পর ওড়িশা, যেখানে কালাহাণ্ডিতে না কোথায় যেতে হবে,—বিহার! যেখানে মুসাহারি সম্প্রদায় কয়েক পরিবার মিলে একটি উনোন জ্বেলে লেট্টি বানায় সুসময়ে,—আমি পারব না আমি ভীরু, আমি পালাচ্ছি। পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখি নি। অনাহার কেমন তা

জানার অবকাশ হয় নি।   এবং বাসোর ছেলে রাকসা ও আমি, দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ দুর্লজ্ব্য।

আমি মনে মনে নেহাত মধ্যবিত্ত।

তাই পালাচ্ছি। তাই চিঠি লিখছি। দেখুন, যদি মা আমাকে দুর্গবন্দী করে মানুষ না করত, তাহলে এতদিনে কয়েকটি ক্ষুদ্র কাব্য পত্রিকা বের করে, কয়েকটি তুলে দিয়ে, অনেক কবিতা লিখে, আমি আমার অন্তরের সাহিত্য পোকা (ছিল, আমারও ছিল। মুখ তুলে ঘুমন্ত রাকসাকে দেখছি, এবং জানতে পারছি ও সব পোকা ছিল কিন্তু আমি জানতাম না) বের করে দিতে পারতাম।

একজন সতর্ক, সাবধানী মায়ের জন্য সময়ের কাজ সময়ে হয় নি। সে জন্যেই এ চিঠিটা সাহিত্য-সাহিত্য হয়ে যাচ্ছে। শুনুন, আমার বন্ধু লিখেছেন বটে—

"বুভুক্ষু ক্ষুধার্ত মানুষ
সে সব কিছু খায়
মুখে পুরে দেয় বালি, রোদ্দুর, পাথর
মুঠো মুঠো লোহা, মেঘ, আগুন
খায় বৃষ্টি, চেটে নেয় অনাবৃষ্টি
অসুখ, লরির চাকা, দেশলাই, ফলিডল
সব সে খেয়ে নিতে পারে
তার এত খিদে
সে নিজেও জানে না
বুভুক্ষু পেট-পিঠ সাঁটা মানুষের একটিই সভ্য গুণ
সে সুখী ও স্বাস্থ্যবান মানুষদের খায় না
যদিও তারা দু'বেলা রটায়
বুভুক্ষু ক্ষুধার্ত মানুষ আদপে নরখাদক।

সার, ওই কবিতার শেষ চারলাইনই সত্য।

রাকসাদের সামনে বসিয়েই আমরা যদি চিকেন খানা খেতাম ওরা কিছু বলত না।

আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, যা পারেন করুন। এখানে মধ্যযুগ। ব্লক অফিসারের বাড়িতে পাঁচ কিলো ঘি ঢেলে কি একটা যজ্ঞ হচ্ছে, তার দুর্গন্ধ এখনো বাতাসে।

গাড়িয়াতে রিলিফ, মেডিক্যাল টিম, পানীয় জলের ট্যাঙ্ক এখন চাই, এবং তারপর চাই ওদেরকে ঘর করে দেওয়া। গ্রাম অবধি পথ। কুয়ো, সেচ, ইস্কুল।

ওদের সরানোও দরকার। কিন্তু জানলাম ওই পাথর, পাহাড়, বিছে, জ্বলে যাওয়া ঝোপ এবং হাস্যকর টুকরো টুকরো দগ্ধ শস্যক্ষেত্র হল সরকার তরফে ওদেবকে নিঃশর্ত ভূমি দান।

আমার দ্বারা হল না, বড়ই দুঃখিত।

—সোম।

মুকুল বাঘের অণুবীক্ষণিক চোখে সোমকে হয় তো "ইন্‌টরেস্টিং" মনে হয়ে থাকবে।

কেন না রণে ভঙ্গ দিয়ে সোম কলকাতায় ফিরে আসে, কিন্তু মুকুল ওকে ট্রাঙ্ককল করেন।

তখন সোমেব মা নেই।

সি. আই. টি-র ফ্ল্যাট সোম ছাড়ে নি।

জয়িব সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে।

জয়িকে ওর বাবা ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছেন, সেখানেই সোম থাকে। যখন অগড়বগড় বেখাপ্পা ট্যুর থেকে বেপট সময়ে ফেরে, তখন ও সি. আই. টিতে রাত কাটায়।

জয়ির বাড়িতে টেলিফোন আছে।

সোম ফিরে এলে ওর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে জয়ি অন্যমনস্কভাবে বলেছিল, বেচারা সোম! সত্যেনকে জানিয়ে দাও। ওদের বড় কাগজ আছে। ভালো রিপোর্ট লিখবে, একটা জনমত তৈরি হবে, আমার ফাইলটা দেখেছ?

জয়ি বড় একটি ফার্মে (ওর বাবার ফার্ম) চার্টার্ড অ্যাকাউন্টদের অন্যতম একজন। হরদম ট্যুর করে।

ওখানে মুকুলের ফোন আসে।

—সোম? ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান বিহেভিয়ারাল অ্যান্ড এথনোলজিকাল অ্যান্ড জেনেটিক স্টাডিজ, ঠিকানা দিচ্ছি, সুদীপ দত্তর সঙ্গে দেখা করো।

কট্।

ফোন কেটে গেল।

সোম সেখানে গিয়েছিল। গালভরা নামের এ ইনস্টিটিউটের সর্বাধিকারী সুদীপ দত্ত অবসরপ্রাপ্ত সরকারী অফিসার। ছোটখাট বিনয়ী চেহারার মানুষ, রক্ত শর্করা খুব নেমে যায় বলে সঙ্গে রাখেন গ্লুকোজ, চকোলেট, এবং দেরাজ থেকে ঝাড়ন নিয়ে মাঝেমাঝেই টেবিলেও কাচ থেকে মোছেন অদৃশ্য ধুলো। এ হেন লোকের আপিস কামরার দেয়ালে একটি বুনো মোষের শিংওয়ালা মাথা সাঁটা। সুদীপ দত্ত কর্মজীবনে "শিকার নিষিদ্ধ" সংরক্ষিত প্রাণীদের শিকার করতেন এবং বর্তমানে "বন, বনের প্রাণী, আকাশের পাখি ও শহরের কাক" বাঁচানোর জন্য ব্যস্ত। কাকরা শহরের জমাদার, সর্বভুক, কাক চলে গেলে কলকাতাও চলে যাবে এ নিয়ে ওঁর অনেক লেখা সংবাদপত্রে বেরোয়।

দেয়ালে টাঙানো, ইংরেজিতে নির্দেশ, কাককে ভালবাসো। প্রকৃতিতে কোনো প্রাণীই অপ্রয়োজনে সৃষ্টি হয়নি।

সুদীপের সঙ্গে কাজ করে সোম আনন্দ পেয়েছিল। সুদীপ ওকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন, যদিও সোম বুঝত, কাজের ছক উনি দেবেন।

নমুনা সমীক্ষা, নমুনা সমীক্ষা।

শহরে এসে যারা ঝোপড়ি তুলছে, তাদের জীবন।

মেদিনীপুরের পান চাষের ব্যাপারে।

পরিকল্পনাহীন কলকাতায় বহুতল বাড়ি গজানোর ফলে ভবিষ্যতে কলকাতার কি কি সমস্যা হবে।

বর্ধমান ও হুগলীর পাঁচটি পাঁচটি গ্রাম ধরে বিগত দুই দশকে চাষের কাজের প্যাটার্নে লক্ষণীয় পরিবর্তন এবং চাষীদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন।

এ সব কাজে তেমন কোনো বিস্ফোরক অভিজ্ঞতা ঘটে নি। গাড়িয়া বিষয়ে সোম আর কোনো খবর নেয়নি। এখানে কাজ চাকরি নয়। একেকটি অ্যাসাইনমেণ্ট এবং সেই অনুসারে টাকা।

ক্রমে সোম ক্যামেরা কেনে, টেপরেকর্ডার। ক্রমে ওর অভ্যাস হয়ে যায় অর্ডার নেওয়া এবং মাল সরবরাহ করা।

কিন্তু একই সঙ্গে মনের মধ্যে এটাও গজাতে থাকে, যে এ সব কাজে তৃপ্তি নেই। কোনো একটা কাজের কাজ করতে হবে যাতে ওর তৃপ্তি আসে।

সব কাজই যেন ধরা হচ্ছে, বারো আনা ছোঁয়া হচ্ছে না, চার আনা খুব খুঁটিয়ে করা হচ্ছে।

জয়ি বলত, খুশি নও কেন?

—কি করছি, এ কি কাজ?

—যা "কাজ" মনে করো তাই করো।

—সেটা যে কি, তাও তো জানি না।

—জানতে চেষ্টা করেছ সিরিয়াসলি? নিজেকে সম্পূর্ণ খুলে মেলে ভেবে দেখেছ কখনো? সেটাই তো কাজ হবে সেটাতে তুমি ইন্‌ভল্‌ভ্‌ড হবে, জড়িয়ে পড়বে।

বলা সোজা জয়ি! সোম যাতে কিছুতে ইন্‌ভল্‌ভ্‌ড না হয়, সে ভাবেই মা ওকে বড় করেন, বোঝান ওটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

—তোমার বাবা না কম্যুনিস্ট ছিলেন?

—শুনেছি, কিন্তু কিছুই তো জানি না।

—নিজের বিষয়ে ভাবো সোম, নিজের বিষয়ে।

—ভাবব, ভাবব।

—আমরাও কিন্তু পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এ কথাটাও ভেবো।

ভাববে, সিদ্ধান্ত নেবে, সেই মতো কাজ করবে, এ সব যদি সোম পারত, তা'হলে তো একদিন জয়িকে ছেড়ে সি. আই. টিতে ফিরে আসত না।

সুদীপ দত্তের পর কিছুদিন বম্বের একটি কাগজের জন্য লেখা।

তারপর, জয়ি যখন জীবন থেকে চলে যায়, ততদিনে সোম নিজের বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ।

কোনো কাজের মতো কাজ, যা তার এই নিরন্তর ভেসে চলা নয়,—যে কাজ করলে সোম নিজেকেও খুঁজে পাবে। তার অস্তিত্বও ছিন্নমূল। কিন্তু সে ছিন্নমূল হতে চায় না।

এই সময়েই ওকে জয়ি একটি খবরের কাগজের কাটিং পাঠায়, যা ও খুলে দেখেনি।

॥ ২ ॥

এই সময়েই ওর বাড়িতে এলেন রাম সেন দীর্ঘদিন বাদে।

দরজাটা খুলে রাম সেনকে দেখবে, সে কথা সোম ভাবে নি।

কলকাতায় সোম আস্ত একটি ছোট ফ্ল্যাটে একলা আছে, জানার পর যখন তখন যে কোনো অবস্থায় যে কোনো বন্ধু আসে, থেকে যায়।

রাম সেনকে দেখে ও স্বস্তি পেল।

রাম সেন জাত ভদ্রলোক। যতদিন সোম জয়ির সঙ্গে ছিল, উনি সেখানে যান নি। তবে পোস্ট কার্ড লিখতেন নিয়মিত। তখন কলকাতায় আসেন নি তা হতে পারে না। এলেও অন্য কোথাও থেকেছেন।

এবার এসেই বললেন, সোম! আমি তোমার বিষয়ে, যারে বলে চিন্তিত।

—কেন জ্যেঠামশাই?

—অশোকবাবুর পোলা তুমি! এত শিখলা, এত ঘুরলা, কোনো কামের কাম করতে পারতা।

—আমারো তো সেই ইচ্ছে। কি যে করব, সেটাই শুধু ভাবছি আর ভাবছি।

—মুশকিল ! অহন বাবা নাই, মা নাই, আমারেই সাহায্য করতে হইব, ইশ্ ! চশমাটা বড়ই ঢিলা।

—কাল ঠিক করে দেব দোকান থেকে।

—হ, আর এক জোড় ক্যানভাছের জুতাও দরকার। চামড়ার জুতার দাম অগ্নিমূল্য, পায়েও লাগে।

—চামড়ার জুতো কিনবেন ?

—না না, ওই ক্যানভাছের জুতা।

—চোখটা দেখাবেন ?

—চক্ষু দেখানো দরকার। কিন্তু সমইস্যা, চক্ষু দিয়া কি দেখুম। আসছিলাম তো দমদমে, মিটিঙে। আমরা কি রাজনীতি করছি ? এই মস্ত পেনডাল, এই চেয়ার টেবুল, এই বরো বরো গাড়ি, এই রাজবেশ নেতাগো ! মণ্টুবাবু কয়, রামদা না ? তা আমি কই, হ। চিনছি, তবও এ্যাও মিটিং, আর আমরা হাটে মাঠে করতাম সেও মিটিং। টাইমে সকলই চেঞ্জ কইরা গিছে, তাই মনে করি। করুক। আবার চেঞ্জ আইব, ইতিহাসের সত্য।

—আগে বলুন কি খাবেন, মাছ ?

—মাছ ! খাওয়াইবা !

রাম সেন ঈষৎ হাস্লেন।

—মাছ তো ভুইলা গিছি। তহন গ্রামে গ্রামে ঘুরছি। জলও ছিল, মাছও ছিল। জুটলে খুব খাইতাম। তোমারই এক মাসি আছিল। খুব পার্টিদরদী। আপন নয়, পাতান মাসি। তিনি আমাগো পাইলে খুব খাওয়াইছে মাছ।

—বেশ, আমি খাওয়াব। কি মাছ আনব ?

—আন না যা হয়। ছোট মাছ পাইলেও আনবা। আমি দিমু কাইটা। পার্টি কমিউনে কতদিন পাক করছি।

—আপনাদের সময় কত ভালো ছিল।

—সেই সব কথা এখন কই। তোমার মায়ে ডরাইত, এই বুঝি রাম স্যান আমার পোলারে রাজনীতিতে টানে। তানারেও দোষ

দেই না। তহন তো রাজনীতি করলে গাড়ি-বাড়ি-চাকরি-ক্ষমতা, এত হইত না। তহন ছিল পুলিশের লাঠি, গ্রামে গিয়া কাম, কল-কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ান, তবে পয়সার গন্ধ আছিল না। যাগারো মধ্যে কাম, তারা যা দিব তাই খাইতে হইব। যহন হোলটাইমারের ওয়েজ হইল তিরিশ টাকা, তাতেই চালাও। তোমার মায়ে কষ্ট করছে।

—আপনাদের সঙ্গে তো এঁরাও ছিলেন।

—আমরা তো ন্যাতা হই নাই।

—পুরনো যুক্ত পার্টির লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়?

—কম। হইলে কথা কই, আনন্দ পাই। তহন তো তা-গারো কইলাম শোধনবাদী, অহন কামদা পাল আর আমি কই, ভাইরে! অহন কে কি বাদী তাই বুঝি না।

সোম বেরিয়ে গিয়ে একটু কাটা রুই নিয়ে এল। এসে দেখে বৃদ্ধ মন দিয়ে কাগজ পড়ছেন।

—সোম! এ চক্ষুর দোষ নয়, দেখ! এই ইলেকটিরিতে ভালো দেখতাছি, ভালো পড়তাছি। হেরিকেনের বাতিতে চক্ষু চলে না। অথচ আগে তো আছিল হেরিকেন।

—এই দেখুন মাছ।

—রুই মাছ! যারে কয় রাজা মাছ!

রাম সেনের চোখে মুখে সে কি আনন্দ।

—পাক আমি করি?

—আমি করব আপনি খাবেন।

ওর রান্না দেখতে দেখতে রাম সেন কথাটি তুললেন।

এতক্ষণ বইসা তোমার কথাই ভাবলাম। অশোকবাবুর পোলা তুমি! হেয় কত কাম কইরা তবে মরল। পঞ্চাশের দশকে আমাদের অনেক কমরেড গেছে সোম! কত সব মানুষ! দ্যাশ তাগারে ভুলল, মাইনষে জানল না, অহন মনে করায় কে, তাই কও। কেও তো একখান বইও লেখল না। আমি জানি না লেখতে, অহন সামর্থ্যও নাই।

—কি ভাবছিলেন ?

—কামের কাম এট্টা, করবা ? ক্ষমতা থাকলে আমিই করতাম, অহন ক্ষমতা নাই। চিন্তাটা আজকের মিটিং দেইখা দেইখা আরো মাথায় আইল। কৃষক সভার মিটিং! কৃষক বা কোথা! সম্পন্ন চাষীদের গায়ে ভাল জামা, হাতে ঘড়ি! খাওয়াদাওয়ার ধুম বা কত! যাউক গা, কালের গতি, গদি পাইছে, হকলই অহন উচ্চ ব্যাপার!

হ্যাঁ এখন বহিরঙ্গে জাঁকজমক বেড়েছে খুব। খরার বছরে মেদিনীপুরে কৃষক সম্মেলনে বাগদা না গলদা চিংড়ি খাওয়ানো হয়। এখন গরিবের সরকার, গরিবের পার্টি কিন্তু ফ্যানফেয়ার ব্যতীত কিছুই হয় না। ওভারহেড খরচা খুব বাড়ছে। চার আনা চাঁদা-তোলা, বাঁশ বাতার চাটাইয়ে খবরের কাগজ সেঁটে আলতা দিয়ে বক্তব্য লেখার দিন এখন এঁরা ভুলে গেছেন।

হাতে তুলি নিয়ে কাগজে বা দেয়ালে বা অক্ষর বোলালে অক্ষরের সঙ্গে ইন্‌ভল্‌ভ্‌মেণ্ট আসে। পার্টিকর্মীর হৃৎপিণ্ড বিশ্বাস করে অক্ষরকে। ওটা এখন নেতাদের কাম্য নয়। ওঁরা মুকুল, সুদীপ। ওঁরাও চান পার্টিকর্মী থাক নিঃস্পৃহ, নির্লিপ্ত। তাই দেয়াল লিখনও করে পয়সা নিয়ে পেশাদারী লোক, পোস্টার ছাপে বড় কোম্পানি। রাম সেনরা এ যুগে প্রাগৈতিহাসিক।

—ভাবতেছিলাম, গ্রামের লোক কবি, কবিয়াল, গীতিকার তাগারো অবদান অনেক! অনেক নিছি আমরা তাগারো কাছ হইতে। তারা মানুষরে জাগাইছে। এক সময়ে মুকুন্দ দাশ যা করত। আমাগো আন্দোলনে গ্রামের এই সব কবিয়াল কোন্ সময়ে কি কি গান লিখছে, গান বাঁধছে, এই লইয়া কেউ লেখে না। তুমি এই কাজটা কর সোম! শান্তি পাইবা।

—আমি কি পারব ?

—পারুম মনে করলেই পারবা।

—বড় কঠিন কাজ।

—কাজ, কাজ। কঠিন বইলা কিছু নাই।

রাম সেন সহাস্যে তাকান।

—কাম করলে পিতৃ তর্পণ হইত।

রাম সেন রাজনীতিক পেনশন পায়, বিধবা ভাইঝি তার ঘাড়ে। তার আবার তিনটি মেয়ে। এতগুলো প্রাণীর সংসার তাতেই হরিপুর কলোনিতে সে এক দোকান দিয়ে বসে আছে। দিনে দশ পনেরো টাকার কেনাবেচা হয়।

—কঠিন মনে করলেই কঠিন! এই তো, তিনটা নাতনী! বিয়া দিতে পারুম না। অগোরে সেলাই ট্রেনিং, তাঁত শিক্ষা, মুরগি পালন শিক্ষা, দিছি লাগাইয়া। আইজও মাটি কোপাইতে পারি, গাছ লাগাইতে পারি, হাত দুইটা চায়, জানো? কিন্তু জানোই তো···

—জমি নেই।

—এইডা আশ্চর্য লাগে। কোলোনিতে আমার বাড়ির লগের জমিটুকুই নিল। অথচ কতজন দ্যাহ, কোঠাবারি বানাইয়া দিব্য···

—আপনার পার্টিই তো সর্বেসর্বা···

—আর ভাবি না। ওই কথা নাতিনরাও কয়। খুব যান সম্মেলনে। অথচ কেও আপনারে পোছেও না। হকলে হকলটি বাগাইয়া লইতেয়াছে, আপনের পার্টি আমাগোরে এট্টা কাজও— কমু আরো?

—বলবেন না কেন, বলুন?

—আমি এদের কই, দ্যাহ, অরা আউজকার পোলা! পার্টিতে আসছে, আসছে! আমাগো আদর্শ ছিল একটা, তা ভুলি ক্যামনে?

—আপনি লিখুন না।

—আমি? বললাম তো, আমার ক্ষমতা নাই। লেখতে পারি না। অহন সামর্থ্যও গেছে। অহন ছানি কাটাইবার পর আর···

—দাঁড়ান, ভাতটা চড়াই।

—চড়াও। গ্রামে থাকতাম। নিজেও রান্‌ছি কত! তহন রংপুর, নীলফামারি, খাওনের সুখ ছিল কত! মাটি কি? যা ফালাইবা তাই ফনফনাইয়া বাড়ব, যারে কয় বীরপ্রসবিনী!

—বাঃ। বীরপ্রসবিনী ?

—নিশ্চয়। কত বীর কৃষকের জন্ম দিছে ওই জেলা! হেয় কত সংগ্রাম! ভুইল না, শহীদ তন্নারায়ণ ওই দ্যাশেরই মানুষ! আর তারে বাচাইতে আগে ছুটছিল বাচ্চাই মামুদ! হেই হকল কথা আউজকার পোলারা জানে? তাগো নামে বান্ধা গান ··না, আউজকাল কি গান গায় ? ইয়ার নাম কি গণসংগীত ?

সোম ভাত নামায়।

—বউয়ের লগে মিলমিশ হইল না ?

মৃত পিতা, সুদূর শৈশব, বহু স্মৃতি, নানা কারণে সোম রাম সেনের মুখে এসব কথা নীরবে শুনে যায়। এবং অস্বীকার করে লাভ নেই, এই বৃদ্ধ একমাত্র লোক, যিনি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলেও ফুঁসে ওঠেন না।

—হ, বুজছি! অহন তোমরা···আসে যায় ?

বড় জটিল ওঁকে বোঝানো। কেমন করে ওঁকে বোঝাবে, যে জয়ি বুঝতে পারছে না, ওর ও সোমের বিবাহিত জীবনটা পারস্পরিক সুবিধার্থে বন্দোবস্তী হয়ে যাচ্ছে কিনা।

সোম বলেছে, না!

জয়ি তা মানে নি।

—তোমাকে আগেই বলেছিলাম, আজকাল বন্দোবস্তী সংক্রমণ থেকে জীবন বাঁচানো খুব কঠিন। আমার বাবা-মার জীবন···ওই জীবনে আমার ভয় ছিল বলেই তোমাকে বিয়ে করি।

—আমাদের জীবন কি ?···

—হয়নি ? আমি অফিস, কোম্পানি ট্যুর, হরদম বাইরে যাওয়া, এই নিয়ে আছি।

—ওটা তো তোমার কাজ।

—এবং তাতে তোমার কিছু এসে যাচ্ছে না।

—বাঃ! এতদিন বাদেও ··

—পাঁচ বছরটা এমন এতদিন নয় সোম! তুমি কাজ করছ, ছাড়ছ যা করবার তা করছ না, অথচ তাতে আমার কিছু এসে যাচ্ছে না।

—ব্যাপারটা যুক্তির ভিত্তিতে দেখ।

জয়ি চিরকাল অত্যন্ত সৎ, অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তা। ওটা ও নিজের গুণ বলে মনে করে না। বলে, আমি এরকমই। শক্ত, প্র্যাকটিকাল, এরকম!

'যুক্তির ভিত্তিতে দেখ' বলতে বলতে সোম বুঝতে পারছিল ও নিজেই জোর খুঁজে পাচ্ছে না কোথায় যেন।

—যুক্তির ভিত্তিতেই দেখছি সোম! তোমার বাবা মা এত অন্যরকম লোক ছিলেন···

—বাবা ছিলেন, মা ছিলেন না। আমার তিন বছর বয়সে বাবা মারা যান। বাবার বিশ্বাসগুলির ওপর মার কোনো আস্থা ছিল না। তিনি ভাবতেন, ও রাস্তা উপোসের রাস্তা।

—খুবই মূর্খামি। কেন না রাজনীতির ব্যাপারটা পিছনে থাকলে সেটা বিশাল পুঁজি। বাপের রাজনীতি মানে ছেলের কেরিয়ার।

—মা বোঝেননি। উনি আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভালো ছেলে করতে চেয়েছিলেন।

—তুমি তখন রিসার্চ করবে বলতে।

—হ্যাঁ জয়ি, এখন আর বলি না।

—আরো দেখ!

—কি?

—আমরা কখনো ঝগড়া করি না, সর্বদা সৌজন্য রক্ষা করে চলি···না, হতে পারে না!

জয়ি ঘরে পায়চারি শুরু করেছিল। জীনস্, গেঞ্জি, ছাঁটা চুল, মোটা কাচের চশমা, মেকাপ নেই, জগিং করা কর্মব্যস্ত জয়ি।

—আমাদের জীবনটা অসম্ভব রকম অ্যারেঞ্জমেণ্ট হয়ে গেছে। সেই জন্যে, আমাদের বেশ কিছুকাল আলাদা থাকা দরকার। আমাদের নিজেদেরই বুঝতে হবে, আমরা পরস্পরকে চাই, না না-হলেও চলে যাবে?

—তাহলে?

জয়ি সদুঃখে বলেছিল, তুমি এখনো বলতে পারছ না, না জয়ি! আমরা একসঙ্গে থেকেই চেষ্টা করতে পারি।

—সিদ্ধান্ত তো তুমিই নিচ্ছ।

—হ্যাঁ, কিন্তু নিতে আমার মনে ব্যথা লাগছে না, মেনে নিতে তোমার মনে ব্যথা লাগছে না, নির্মলাকে দেখেছ?

—নির্মলা? আমাদের ঠিকে ঝি?

—পার্ট টাইমাব বলো।

—ওই হল। ওকে দেখেছি মানে?

—ও আব ওর স্বামী প্রচণ্ড ঝগড়া করে, আবাব দু'জনে দু'জনকে প্রচণ্ড ভালবাসে। ওর স্বামী কতদিন বসেছিল। কারখানায় কাজ পেতে নির্মলা পুজো দিল!

—ওদের ব্যাপারটা অন্যরকম জয়ি!

—তোমাব উত্তর জানি, ওদের জীবনের সঙ্গে শিকড় আছে, ওদের নেই আমাদের মতো বানানো সমস্যা। কিন্তু এসব সমস্যা আমরা বানাই না। বর্তমানে একটু ওপরতলার জীবনে এসব সমস্যা এসে যাচ্ছে।

এবং মানুষ যে-যার মতো সমস্যার সঙ্গে বসবাসের বন্দোবস্ত করে নিয়ে বাঁচছে। সেটা কোনো জীবন নয়। মানুষের নকল ওরা। না জয়ি! আমি তা হতে চাই নি।

জয়ি আশ্চর্য, আলো, আলো করা হাসি হেসেছিল। বলেছিল, বেশ তো! আমিও ভাবি তুমিও ভাবো। আর এ ফাউণ্ডেশনের হয়ে একটা কাজ, ওর হয়ে আরেকটা, না! তুমি নিজেকেই আবিষ্কার করো না, তোমাকে বাঁচিয়ে দেয় এমন কোনো কাজের মধ্যে ঢুকে গিয়ে?

এতসব আলোচনার পর আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত। জয়ির বাবার উপহার স্বরূপ ফ্ল্যাটে (এগারোতলা, দু' হাজার বর্গফুট), থাকার সময়েও সোম ওর মায়ের যোগাড় করা সি-আই-টি'র ছোট ফ্ল্যাটটি ছাড়েনি। সেখানেই ও ফিরে এসেছিল, ওর অভ্যস্ত পরিবেশে।

দু'বছর হতে চলল। এখনো দু'জনের নিয়মিত অনিয়মিত দেখা হয়। সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো। আবার এ কথাও সত্যি যে এ-ওকে বলে না, এসো, আবার একসঙ্গে থাকি।

কিন্তু এসব কথা এই বৃদ্ধকে বলা বা বোঝানো বড় কঠিন।

বড় বড় গ্রাসে উনি ভাত খান। আঁচাবার সময় বাঁধানো দাঁত খোলেন। তারপব ঘরের দেয়ালে জনৈক কটমটে চাহনিযুক্ত ব্রহ্মচারীর ছবি দেখেন।

—মায়ের?

—হ্যাঁ।

—এই রোগেও ধরছিল?

—শেষের দিকে।

—খুবই আশ্চর্য পবিবর্তন। আগে তো···

—হ্যাঁ হঠাৎ হল।

—হঠাৎ কিছু হয় না হে। বৃক্ষ তুমি হঠাৎ দেখ। বীজ কিন্তু ভিতরে সাঁজায় আছিল। যাউক গা! তা নিজে পাকসাক করতে কষ্ট হয় না?

—না না, আমি বেজায় স্বাবলম্বী।

সোমের বয়স আটত্রিশ। পঁয়ত্রিশ বছর আগে মৃত রাজনৈতিক সহকর্মীদের স্ত্রী পুত্রের সংবাদ রাম সেন ১৯৫৪ থেকে নিচ্ছেন।

—দ্যাহ সোম! পার্টি ভাগ হওয়া তক যদি অশোকবাবু থাকত, হেয় কোন দলে যাইত, আমাগো লগে থাকত কিনা, কিছুই জানি না। তোমার কি মনে হয়?

—কেমন করে বলব? মা কিছু বলত না। বাবা নিজেও চলে গেল আমার তিন বছর বয়সে। আমার বাবা কেমন ছিলেন, আমিই জানি না। শুধু মনে হয় বাবা থাকলে আমি অন্যরকম মানুষ হতাম। একা আপনার মুখে বাবার নাম শুনি। আর তো কেউ বলে না।

—ওই তো কইলাম, তহন কতজন চইলা গিছে, কেউ কিছু

লেখে না। ভাবি, ক্ষমতায় না আইসা যদি বিরোধী দলে থাকতাম, মাইনষের লগে সম্বন্ধ থাকত। তহন কিষাণ কও, মজদুর কও, ছাত্র কও, কোনো না কোনো ফরণ্টে কাম কইরা যোগ্যতা দেখাইয়া তয় পার্টি কার্ড মিলত আর পার্টি কার্ড নিলে আরোই কাম করতে হইত। অহন কাম না কইরা বেতন নেয় সরকারী কর্মচারী। রাজনীতিতেও কাম না কইরা, জনগণের কথা কিছুই না ভাইবা, সবাই পার্টিতে ঢুকতাছে। গ্রামে ধনীরা, শহরে ব্যবসায়ীরা, হকলেই সমর্থক। পার্টির অহন আগাছা দরকার, ধান মরলে পার্টি ভাবে না, আগাছা বাচায়।

ওঁর কথায় কোনো রাগ দুঃখ নেই। আছে বড় গভীর কোনো উদ্বেগ, কোনো বিপন্নতা বোধ। কিন্তু ওঁদের মতো মানুষদের তো আর দরকার নেই। এখন কাদের দরকার? হৃদয়হীন রোবট সেনানীদের? যারা হবে আজ্ঞাবহ, মদমত্ত, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন?

—অহন তো "অন্যায় করতাছ" বললেই মার দেয়! গ্রামের অবস্থা তো দেখি। আরে, আজ যদি মইরা যাই, কেউ জানব? কেউ দিবে খবরটা কাগজে?

—না না, নিশ্চয় দেবে।

—কেউ না। জেলার কাগজ দিতে পারে। যাউক গা! কাল জুতাটা কিনুম, চশমাটা ঠিক কইরা দিবা। মাছটা বড় আস্বাদের আছিল সোম।

—কালও আনব।

—না না, অত খরচে কাম নাই।

রাম সেন হাঁ করে ঘুমিয়ে পড়েন।

রাম সেনকে বড় দরকার সোমের। রাম সেনের কথাবার্তার মধ্যে ও ওর বাবাকে পায়। বাবাকে জানে না, চেনে না, মার সঙ্গেও কেমন একটা অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল। সোমের যে কাজ অপছন্দ হত মার, সেটাই নাকি বাবার মতো।

সোম ছিন্নমূল, সোম উদ্বাস্তু।

ওর সাংবাদিক বন্ধু সত্যেন, যে বেশি মদ খেলে বাড়ি ফেরে না, সোমের ঘরে এসে সোফায় ঘুমোয়, সে সর্বদাই সকালে কফির পর সক্রেটিস।

—তোমরাও একটা অন্যভাবে উদ্বাস্তু জেনারেশন। বাবাদের মতো রাজনীতিক বিশ্বাস বা কোনো রাজনৈতিক আনুগত্য নেই। শিকড় নেই কোথাও, কোনো বিশ্বাস।

—তোমার আছে? কোনো বিশ্বাস?

—নিশ্চয়। আমি বিশ্বাস করি মদ ও সিগারেট সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। বিশ্বাস করি, খাওয়াতে পারলে প্রত্যেকের চার পাঁচটা সন্তান দরকার। বিশ্বাস করি যে আমার বউ মেয়েটাকে একটা অপদার্থের ঘাড়ে গচাচ্ছে। ক'টা বিশ্বাস চাও?

—সে জন্য কিছু করো?

—করব কেন? আমরা তো বাস্টার্ড জেনারেশন।

—তুমি! সত্যি!

—তুমিই বা কি? সেদিন জয়ি কোম্পানির খরচে বাড়িতে পার্টি দিল। যে অমন রাঁধতে পারে…

—ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা নয়!

—যা ভাল বোঝ করো বাবা! আমি গৃহযুদ্ধ সামলাতে চললাম। না, আমার বউ ভালো। একটা ইলিশ নিয়ে ঢুকতে পারি তবে…

—সেবারের মতো বলো না যে সারা রাত পুকুরপাড়ে বসে ইলিশ ধরছিলে।

—হ্যাঁ, ওটা একটা…

—ইলিশ পুকুরে হয় না।

—মনে আছে।

—ইলিশ কিনতে পারছ যখন…

—তোমার ধারের টাকাটা তো? ভাই! বঙ্গলক্ষ্মী থেকে সিকিম, সব টিকিট কিনে যাচ্ছি একদিন লেগে যাবে। সেদিন তোমাদের প্রত্যেকের পাওনা…বাই বাই!

॥ ৩ ॥

রাম সেন ঘুমিয়ে পড়লে সোম আলো নিভিয়ে দিয়েছিল। এ বাড়িতে দুটো ঘর। বাথরুম, রান্নাঘর, বারান্দা। আগে বাইরের ঘরে সোম থাকত, ভেতরের ঘরে মা।

এখন বাইরের ঘরে বহিরাগত, ভেতরের ঘর সোমের ঘর। এ ঘরের লাগাও বারান্দা, সামনে রেল লাইন। খুব খোলামেলা, ঘরটি খুব গোছানো। আগে বিয়ের পর পর, মাঝে মাঝে জয়ি আর সোম এ বাড়িতে এসে সারাদিন কাটিয়ে যেত। বাড়িটা খরচ করে ঠিকঠাক রাখত ও জয়ি বলত, এত কম ভাড়া, এটা তো করাই উচিত।

ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে সোম ডাকের চিঠিপত্র দেখতে শুরু করল। জয়ির পাঠানো লম্বা, ভারি কাগজের খামটা খুলেছিল অনেক প্রত্যাশায়। সোম মাঝে মাঝে চিঠিও লেখে।

জয়িও জবাব দেয়। জয়ি মানেই, শৃঙ্খলা, কর্তব্য, চিঠির জবাব। বাংলায় লেখা ওর আসে না।

"সোম, এই কাটিংটা দেখ। এরা খুব নাম করেছে, ভারতের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। তোমার কাজের সুবিধা হতে পারে। কোনো তেমন রিসার্চের স্কীম পাঠাও। যা তোমার মনকে তৃপ্তি দেবে। আমি যথারীতি খুবই ব্যস্ত। তবু নিজেদের কথা ভাবি। ভালো থেকো।—জয়ি।"

কাটিংটা পড়ল সোম। "গো ফর ট্রুথ" বা গোফট্রু একটি সংস্থা, যা মৌলিক চিন্তাধারার গবেষণার কাজে সাহায্য করবে এবং গবেষণার কাজটি প্রকাশ করবে।

গোফট্রু সেই সব গবেষণায় প্রকল্প চায় যা বিশেষভাবে ভারতীয়। গ্রামভিত্তিক গবেষণা হলে আরোই ভালো। এই সংস্থা, প্রকল্প অনুমোদনের পর, গবেষককে টাকা দেবে। গবেষকের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে প্রকল্প গঠনে, বিষয়বস্তু নির্বাচনে, আগ্রহী গবেষকরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।"

সোমের মনে হয়, এটা আশ্চর্য যোগাযোগ। রাম সেন বললেন,

বাম রাজনীতিক আন্দোলনে লোককবি, গণকবিয়ালদের অবদানের কথা লেখো।

জয়ি এই খবরটা জানাল।

রাম সেন বললেন, পিতৃতর্পণ হবে।

সোমের বাবা কি বেঁচে থাকলে এই কথাই বলতেন? কে জানে?

এ কাজটা করলে কি সোম জানতে পারবে সে ছিন্নমূল নয়?

সে কি দেখবে, সব কিছু বন্দোবস্তী নয়?

জানে না সোম, সত্যিই জানে না।

কিন্তু ওই সংস্থাকে চিঠি লিখতে দোষ কি?

বেশ সময় লেগে গেল ভেবে ভেবে চিঠিটা লিখতে।

"বাংলায় জনচেতনা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা—চেতনা জাগাবার কাজে গণকবিয়াল ও লোকগীতিকাররা বিশাল অবদান রেখে গেছেন। এঁদের দেখা গেছে কম্যুনিস্ট আন্দোলনেও সহায়তা করতে।

লোকগীতি, গ্রামীণ শিল্পীদের রচিত গান, তা ইতিহাসের উপাদান। আজ ইতিহাস লিখতে হলে লোকবৃত্তের এই অবদানকে ইতিহাসের উপাদান মনে করতে হবে। আমাদের দেশে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা এ সব গানে ধরা আছে।

বাম রাজনীতিক আন্দোলন ও লোকগীতি। এটাই আমার গবেষণার বিষয়। এ জন্য আমাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে। এঁদের গান ছাপা নেই। বহু জন মৃত। প্রাচীন লোকদের সাহায্য পেতে হবে। অন্তত দু'বছর লাগবে বলে মনে করি। কাজে নামলে তবে বুঝব আরো সময় লাগবে কিনা।

আমার বায়ো-ডেটা এবং কয়েকটি লেখার জেরক্স্ কপি সঙ্গে পাঠালাম তোমরা আমার বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে আগ্রহী হলে এই ঠিকানায় জানালে আনন্দিত হব।"

চিঠির উত্তর বেশ তাড়াতাড়ি এসেছিল।

"বিষয়বস্তু অনুমোদিত। বিশদ আলোচনা করার জন্য দিল্লী আসা দরকার। আমরা এক পিঠের ভাড়া দেব।"

সত্যেন শুনেই বলল, চলে যাও। সবাই যাচ্ছে।

—সবাই যাচ্ছে মানে?

—অরুণ যাচ্ছে। বাইলাডিলার ঢোকরা এবং বাঁকুড়ার ঢোকরার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা।

—আর কে যাচ্ছে?

সোমেব কোথায় খারাপ লাগছিল।

—ভিকাশ পুরঞ্জয় যাচ্ছে। সুন্দরবনেব বাঘের জন্যে মানুষ, না মানুষেব জন্যে সুন্দরবন+দক্ষিণ রায়+বনবিবি।

—এটা নিয়ে ও চারবার লিখেছে।

—আবাব লিখবে। অরুণ কি ঢোকরাদের নিয়ে আগে লেখেনি? ওরা একটি বিষয়বস্তু নিয়ে যতটা পারে করে নিচ্ছে। এবং দুটোই ওদের ডকটরাল থিসিস হবে।

তাই হোক। জ্যোৎস্না রাতে সবাই বনে যায়, সোমও যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের সময়ে "বন" শব্দের মানে অন্য রকম ছিল। এখন সবকারী বাংলা ভাড়া করে সরকারের তৈরি সমাজভিত্তিক ইউক্যালিপটাস বনে জ্যোৎস্না রাতে স্বচ্ছন্দে যাওয়া যায়। কোনো ভয় নেই।

যাবার আগে সোম দুটি চিঠি লিখল।

"জয়ি! অজস্র ধন্যবাদ। দেখো, এবার হয়তো একটা কিছু করে ফেলব। সময়টাও যা বেছে নিয়েছি, সে সময়ে আমার বাবা খুব সক্রিয় ছিলেন। তুমি তো জানো, আমি অনেক দিন ধরে বাবাকে খুঁজছি। বাবার কথা সব জানতে পারলে, তাঁর কথা সময়ের কথা জানতে পারলে আমি আমার সমস্যার সমাধান পেয়ে যাব।

আমার সমস্যাটা কোনো দিন বলা হয় নি।

আমি ছিন্নমূল আমার সময় থেকে। আমার জন্ম সাতচল্লিশে। সে সময়ে তেভাগা আন্দোলন চলছিল, ভাটা পড়েছিল, আবার তা জেগে ওঠে এবং পঞ্চাশ অবধি চলে।

বাবা কি ঘরে বসেছিলেন? জানি না।

তারপর থেকে মা আমার ওপর দুটো নৈতিক চাপ দিতেন। নৈতিক চাপের চেয়ে মারধোর ভালো।

এক,—বাবার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নয়। তিনি রাজনীতি করে ভুল করেছেন। বিয়ে করা বউ। নিজের ছেলের কোনো ব্যবস্থা করেন নি। রাজনীতি কোর না সোম। রাজনীতি করলে মানুষ তোমার বাবার মতো স্বার্থপর, দায়িত্বহীন হয়ে যায়।

দুই,—আমি নিজেকে ক্ষয় করে তোমাকে বড় করেছি। ভালো ছাত্র হয়ে, ভালো কাজ বাগিয়ে আমাকে প্রতিদান দাও।

শেষের দিকে মাকে মারলেন এক গুরুদেব। হঠাৎ এক জীবন্ত ঈশ্বর পেয়ে তাঁর জন্য উপোস, ধ্যান, নাম জপ, করতে থাকলেন। দীক্ষা নেবার পর একে একে ছাড়লেন সব খাদ্য। দিনে আতপ চালের ভাত ও লবণ। রাতে এক কাপ দুধ। মার দেহে সইল না। এবং অসুস্থ হলে যতক্ষণ জ্ঞান ছিল ডাক্তারের ওষুধ খান নি। গুরুদেব তখন ম্যানিলায়। তাঁকে না জানিয়ে খাবেন না।

আমি মোটামুটি ভালো ছাত্র হলাম, ঢুকলাম বিজ্ঞাপনের আপিসে, (সেখানেই তোমার সঙ্গে আলাপ) মাকে প্রতিদান দিতে থাকলাম। কিন্তু মা তখন আর আমার কথা ভাবেন না। গুরুদেবই তাঁর সর্বস্ব।

আজ গুরুদেবের ছবিটা সরালাম।

অরাজনীতিক হয়ে যে বড় হলাম। কিন্তু জন্মেছি তো মধ্যবিত্ত ঘরে। অরাজনীতিকতার জন্যে অপরাধবোধ থাকে না তাদের, যাদের ঘরানা অন্য, যারা সরকারে, ব্যাঙ্কে, বড় কোম্পানিতে যাবার জন্যেই জন্মেছে।

ওদের সমাজ আমার নয়। কুণালদের দেখেও কুঁকড়ে যাই। এভাবেই আমার নিজস্ব পরিচয় খুঁজে পাবার সমস্যা গড়ে ওঠে।

এতদিনে বললাম।

তুমি বলো, তাতে কি? এখন জীবন মানেই বন্দোবস্তী। মন্ত্রী ও নেতারা জনগণকে মুখোশ দেখান। মুখ বের করেন অন্যত্র। জনগণের পয়সায় তাঁরা ওড়াউড়ি করেন, গাড়ি চাপেন, বিদেশে ছোটেন। এই তথাকথিত বাম রাজনীতিও চলছে বন্দোবস্তীতে।

তুমি বলো, সত্যেন ঘোরে প্রেমিকার সঙ্গে, সঙ্গে তার বউ তা জানে, কিন্তু বন্দোবস্তী সেখানেও। এ-ওর সঙ্গে চমৎকার চলছে।

আবার সে মেয়েটিও বিবাহিতা, সে কোনো না কোনো বন্দোবস্তীতে মানিয়ে চলছে।

তুমি বলো, বাজারিয়া-ব্যাপারী-রিকশাঅলার সঙ্গে পুলিশ ও মস্তানদের বন্দোবস্তী।

আর বর্তমান রাজনীতি তো সর্বত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে এরা ন্যায্য আন্দোলন করতে গেলে মাব খায়। যারা মারে তাদের সাত খুন মাপ।

উপাচার্য নির্বাচিত হয়েও ঢুকতে পারেন না।

এ রকম খুঁজতে গেলে শেষ নেই।

তুমি বুঝতে পারছ আমি এখনো খুব বিভ্রান্ত। কিন্তু কম্যুনিস্ট আন্দোলন ও লোকগীতি বিষয়টা নির্বাচন করে বহু দিনের মধ্যে আমার ভালো লাগছে। বিষয়টা নিয়ে কাজ করতে বসে গেলেন রাম সেন। তাঁকেও লিখছি। —সোম।"

রাম সেনকে ও লিখল, "কম্যুনিস্ট আন্দোলন ও লোকগীতি নিয়ে হয়তো কাজ করব। আমার কার কার সঙ্গে দেখা করা উচিত হবে, তাঁদের নাম, ঠিকানা, আমার একটা পরিচয় পত্রও দরকার হবে। আমি দিল্লী যাচ্ছি। আপনি এলে একতলার মাসিমার কাছ থেকে চাবি নেবেন, বলে যাচ্ছি।"

এত কিছুর পর দিল্লী চলো।

"গো ফর ট্রুথ" সংস্থার আপিসটি খুব সাজানো। এটাই

প্রত্যাশিত। পরিচালিকা বা ডিরেকটর পরভীন মালহোত্রার বয়স
বড় জোর তিরিশ। পরনে জীন্‌স, গায়ে পাঞ্জাবি, কাঁধের ঝোলাটি
চামড়ার, দেয়ালে ঝুলছে।

অরুণ বা ভিকাশ ছিল না।

ওরা কি ডাক পায় নি?

পরভীন মালহোত্রা ফাইল খুলল। ছাঁটা চুল, অত্যন্ত কর্মকুশলী
চেহারা, দিল্লীতে এমন মেয়েদের খুব দেখা যায়।

—সোম··· দত্ত! হ্যাঁ। কলকাতা খুব অদ্ভুত শহর। আমর
ওখান থেকেই সব চেয়ে বেশি সাড়া পেয়েছি। তুমি মুকুলকে
জানতে? তার কাগজে লিখেছ?

—জানতাম।

—মুকুল তোমার কথা বলতেন।

—তুমি ওঁকে জানতে?

—খুব। আমি তখন "ফুড ফর দি হাংরি"-তে। তুমি চলে
এলে, আমরা ঢুকে গেলাম গাড়িয়াতে। হ্যাঁ, খাবার, ওষুধ, জামা-
কাপড়। ওদের ঘর হবে। একটা কম্যুনিটি হল, টিউবওয়েল।
যথারীতি সরকার বাধা দিল। আমরা চলে এলাম, যাক গে।

—আমি জানতাম না।

—কাগজে বেরিয়েছিল, আমাদের বুলেটিনে। কফি?

—না, দরকার নেই।

সোম ভাবল, এটা আরো বড় বন্দোবস্তী। সরকার সাহায্য
করবে না গাড়িয়াকে। ঢুকে যাবে গো-ফ্‌-ট্র্‌। গো-ফ্‌-ট্র্‌ কাজ
করবে না। অতঃপর, ভারত সরকার যে কি হৃদয়হীন, তা ওদের
বুলেটিনে ছাপা হবে। পড়বে বিদেশের মানুষ। পড়বে, আরো
বিদেশী টাকা পাঠাবে।

—তোমার প্রজেক্‌ট আমরা দেখেছি। ভালোই হবে। আমরা
চাইছি রাজনীতির ব্যাপারটা আসুক। ত্রিপুরা আর পশ্চিমবঙ্গেই তো
কম্যুনিস্ট সরকার। বেশ ভালো হবে। গ্রামগুলোর বিশদ বিবরণও

দিও। ওই সব লোক·· কবি · তাদের জন্যে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। ওরা কেমন অবস্থায় আছে···

—তোমরা সাহায্য দেবে?

—আর কে?

পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরা বিষয়ে পরভীন এত ভাবিত কেন? বামফ্রণ্ট সরকার আছে বলে?

—পশ্চিমবঙ্গ খুব সেনসিটিভ রাজ্য। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সব ব্যর্থতা সত্ত্বেও অনেক ভালো। তোমাদের সংগঠন তো।···

—হাসিও না। বিদেশের টাকায় কাজ করে এমন সংগঠন পশ্চিমবঙ্গে কিছু কম আছে?

—অনেক?

—অনেক। রাজ্যসরকার জানে। না জানলে এরা মাঠে নামল কেমন করে? আমরা তো ওখানে আরো কাজ করিয়েছি।

—এটা জানতাম না। সোম বোঝে, তথাকথিত অরাজনীতিকতার কারণে সে সত্যিই অনেক কথা জানে না। খবর রাখে না।

—ক' বছর লাগবে মনে করো?

—বলেছি দু'বছর। কিন্তু কাজ শুরু করলে তবে বুঝব।

—হ্যাঁ···সময় বেশি লাগলে লাগবে। যেটা আমরা চাইছি, সেটা গো ফর ট্রুথ। যা সত্যি তাই লিখবে।

—সে জন্যেই তো যাচ্ছি। কিন্তু নির্জলা সত্যি কি তোমরা লিখতে দেবে?

—কাজটা কতটা জরুরী মনে করো?

—কাজটা আমাকে করতেই হবে। তোমরা যদি সাহায্য না করো, আমি নিজেই করব।

—না, আমরা সাহায্য করব। ফিলিপিন, নাইজেরিয়া, সর্বত্র আমরা কাজ করাচ্ছি।

সোম বুঝতে পারে, সত্যের উদ্‌ঘাটনে ধাবিত হও ব্যাপারটা কি

গোলমেলে। বোঝে, যে এরা তাকে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু কাজটা করার জন্যে মনে বড় আকুলতা।

—তোমরা কি আন্তর্জাতিক সংস্থা?

পরভীন উত্তরটি এড়িয়ে যায়।

—দিল্লীতে কোথায় আছ?

—এক বন্ধুর বাড়ি।

—আমাদের গেস্ট হাউসেও থাকতে পারো।

—না, ধন্যবাদ।

—কাজটা শেষ হলে আমরাই ছাপব। এই যে আমাদের পাবলিকেশন লিস্ট, ব্রোসিওর।

দিল্লীতে ছাপা, লণ্ডনে ছাপা, প্যারিসে ছাপা, এমন কি রোমেও। কারা এদের টাকা দেয়? ভাববে না সোম, ভাববে না। কাজটা এদের টাকায় করে নেওয়া যাক। তারপর দেখা যাবে।

—ইংরিজিতে ছাপবে?

—হ্যাঁ।

—আমি বাংলায় বই করতে পারব?

—সেটা আমরা অনুমোদন করলে। আচ্ছা, কাল এসো। টাকা পয়সার ব্যাপারে চূড়ান্ত কথাবার্তা হবে। টেপরেকর্ডার, ক্যামেরা, টাইপরাইটার, একজন অ্যাসিস্‌টান্ট···অভিনন্দন!

বেরিয়ে আসে সোম। ডিফেন্‌স কলোনিতে আপিস কেন? এই সংগঠন এ রকম একটা ব্যাপারকে টাকা দেয় কেন? সংগঠনটিতে কোন্ কোন্ দেশ টাকা দেয় এবং কেন দেয়?

সোম প্রশ্নগুলিকে বলে, ঘুমিয়ে পড়ো। ও তো এতদিনে জেনে গিয়েছে ভারতে এ রকম সব বিদেশেপুষ্ট সংস্থা অনেককাল হল ঢুকেছে, ঢুকছে কাজ করছে। বন্দোবস্ত এ রকম, এরা ঢুকে যাবে গ্রামে গ্রামে, গ্রামোন্নয়নে, নারকেল চারা রোপণে, গবেষণায় সাহায্য দানে। বন্দোবস্ত এ রকম।

দিল্লীর সবুজ দেখতে দেখতে গাড়িয়ার কথা মনে হয়। দিল্লী গাছে

গাছে সবুজ। কিন্তু রাজনীতিক পরিবেশ, ব্যবসায়িক পরিবেশ, এ সবই দূষিত, দূষিত। ওই আশ্চর্য গাছগুলি সে পরিবেশ দূষণ ঠেকাতে পারবে না। দিল্লী ও ভারত, গাড়িয়াও ভারত তা কেমন করে হয়?

দিল্লী থেকে ফিরেই সোম রাম সেনের চিঠি পায়। জয়িব চিঠিতে লেখা ছিল, অভিনন্দন। একমাস থাকছি না।

বাম সেন একটি অন্তর্দেশীয় পঁয়ত্রিশ পয়সার ফ্ল্যাপকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করেছেন।

প্রথমেই ভোলানাথ দত্তের কাছে যাইবে। বনগাঁ মহকুমায় ভিতরগাছি গ্রামে তিনি থাকত। তিনির ভাগ্নাকে তুমি চিন। তাহার নাম মনে নাই কিন্তু তিনি বলিত যে অশোকের পুত্রের বন্ধু। অশোকের পুত্র এ কাজ করে নাই কিন্তু ভাগ্নাটি নকশাল হইয়া বসিয়া আছে। এখন অবশ্য সে নকশাল নাই। ভোলানাথ দত্তের কাছে যাইবে। তিনি তোমাকে অন্যদের খবর দিবে। তোমার পরিচয় পত্রের দরকার নাই। আমি কামদাবাবুর সহিত বিশেষ আলোচনা পূর্বক লিখিতেছি। তিনি ও আমি মনে করি অশোকবরণ দত্তের পুত্র, ইহাই যথেষ্ট পরিচয়। এই পত্র সঙ্গে রাখিবে, প্রয়োজনে দেখাইবে। এবং যেখানে যাও, শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখিবে, সাবধানতা হারাইবে না। জল, খাদ্য, লক্ষ্য রাখিও। সাঁতার না জানিলে নদী পুষ্করণীতে নামিবে না এবং তোমার উত্তর দিকের জানালার কাঁচ ভাঙা, মেরামত করাইয়া যাইবে। কলিকাতায় চোরের উৎপাত। এখন এখানেও। আর বিশেষ দ্রষ্টব্য, পেনশনভাগী রাজনীতিকগণ রেলপথে বিনা খরচে দুই জনে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের যে সুবিধা পাইবে, সে বিষয়ে বিতং জানাইবে। আমি ও কামদা-বাবু একবার বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, কেনিং, বসিরহাট ও নবদ্বীপ ভ্রমণ ইচ্ছা করি। পুরাতন কমরেডদের দেখিবার ইচ্ছা এবং কেনিং টাউনে কামদাবাবুর ভাস্তা থাকে। অধিক কি, সর্বদা পত্র

দিয়া সুখী করিবা, আশীর্বাদ লইবা। শুনিলাম তিনমাস লাগাত আমি ইলেকটিরি পাইতে পারি, এখানে সর্পের উৎপাত হইয়াছে। ইতি নিত্যাশীর্বাদক রামচন্দ্র সেন।"

সোমের বুক ভরে যায়, ভরে যায়। ভোলানাথ দত্তের ব্যাপারটাও বুঝতে পারছে কার কাছে খোঁজ পাবে।

কিন্তু তার জন্যে এই গভীর দুশ্চিন্তা রাম সেনের। অশোকবরণ দত্তের ছেলে বললেই সবাই চিনবে? মা কোনো দিন বলে নি, ওটা বলার মতো নাম। অশোক বরণ! বাবার নামের মধ্যে নাম যে "বরণ" ছিল তাও তো সোম জানত না।

সাঁতার ও জানে এবং বাইরে ঘুরে অভ্যাস ওর আছে। সে কথা রাম সেনকে লিখতে হয়। ইনল্যাণ্ডে লিখেছেন মানে নিজের বিড়ির খরচা থেকে বাঁচিয়েছেন।

কিন্তু রেলের পাস পেলে একদা শোধনবাদী দলের কামদাবাবু এবং আজকের গদি আসীন দলের রাম সেন কোথায় যাবেন? কোন কোন কমরেডের কাছে?

সোম রাম সেনের জন্যে এক জোড়া লুঙ্গি, এক জোড়া গামছা, দুটো চল্লিশ সাইজের গেঞ্জি (জল পড়লেই ছোট হবে) কিনবে, রেখে যাবে, লিখে দেবে এটাও লিখতে হবে, যে রেলভ্রমণের খোঁজখবর উনি জেলা সদরে পাবেন। আরো জানতে হবে, দুই বৃদ্ধের দেশ ভ্রমণ কালে দরকারে ওঁরা যেন মাঝে মাঝে এখানে থাকেন। দেশভ্রমণই বটে। কাশ্মীর নয়, কানাডা নয়, বর্ধমান, বীরভূম, কেনিং। এটাই সত্যি দেশভ্রমণ বটে। "কামদাবাবুর বাসায় ইলেকটিরি আছে" রাম সেন বলেছিলেন, "তিনি আসে সময় কাটাইতে, কথা কহনের মানুষ নাই ঘরে।"

রাম সেনকে ও যেমন দেখেছে তাতে ওঁর দল ও শাসক দল যে এক, তা কে বলবে?

এখন কুণালের কাছে যেতে হবে।

কুণাল ওর স্কুলের বন্ধু। স্কুলের পর সোম গেল সেন্ট জেভিয়ার্সে, কুণাল গেল আশুতোষ কলেজে। তারপর সে সময়ের অনেক উজ্জ্বল ছেলের মতো কুণালও এম. এল. হয়ে যায়।

সোমের তো সাহস ছিল না, বুঝত না কিছু। খালি ভয় পেত। মনে মনে বন্ধুদের শ্রদ্ধা করত।

তবু কখনো সখনো বন্ধুদের হয়ে কোনো খবর পৌঁছতে পারলে, কোনো সাহায্য করতে পারলেও বর্তে যেত। খবরগুলো এত তুচ্ছ (গুরুত্বপূর্ণ খবর সোমকে দেবে কেন? প্রশ্নই ওঠে না) যে সোম কেন, যে কেউ সে খবর পৌঁছতে পারত।

সোমের বন্ধু কুণাল জেল খেটেছিল কয়েক বছর। জেল থেকে বেরোবার পর ও একটি ইনভেস্টমেন্ট কারবারের আপিসে ঢুকে যায়। ও বিয়ে করে নি। এখন আর ও এম. এল. করে না, তবে যারা করে তারা সাহায্য চাইলে সাহায্য করে।

কুণাল থাকে ওর সেই বন্ধুর বাড়িতে যে ওকে রাজনীতিতে এনেছিল। সে বন্ধু সে সময়েই পুলিশের হাতে মারা যায়। জেল থেকে বেরিয়ে খুঁজে খুঁজে কুণাল ওর বন্ধুর বউকে পেল চার নম্বর পুলের কাছে, মূলত মুসলিম বসতি-ঘেরা একটি বাড়ির দু'খানা ঘরে।

নীলা টিউশনি করে ছেলে ও মেয়েকে (বাবা মেয়ের সম্ভাবনা জেনেছিল, মেয়েকে দেখে নি) মানুষ করছে।

—ছেলের নাম অনিকেত মেয়ের নাম মিত্রা। ওর অনমিত্র নামের সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছি।

—বীরুদার নাম তো অনমিত্রই ছিল।

নীলা মুখ ফিরিয়ে বসেছিল, এটা আবুলদের বাড়ি। আবুলই আমাকে এখানে আনল।

—আবুল নিজে কোথায়?

—আসানসোলে।

নীলাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কুণাল ওইখানেই চলে আসে। ওদের সংসারের ভার তুলে নেয় মাথায়।

সেও অনেকদিন হ'ল।

এখন কুণাল নীলাকে বিয়ে করতে পারে, চায়ও। কিন্তু নীলা তাতে রাজী নয়। আগে হলে সে এ কথা ভাবতে পারত, এখন ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে। তার চেয়ে কুণাল বিয়ে করুক, চলে যাক অন্যত্র। নীলার চেয়ে অনেক ভালো মেয়ে পেয়ে যাবে।

কুণাল অবস্থাটা মেনে নিয়েছে। ওর বন্ধুরা আশা করে নীলা সময় থাকতে মত বদলাবে।

জেলফেরত কুণাল সোমকে অনেক বিষয়ে কথা বলে, সোমকে বোঝায়।

জয়ির সঙ্গে আপসে আলাদা থাকার ব্যবস্থা মেনে নিল সোম, কুণালের কি রাগ!

—কি কারণ শুনি?

—ওদের সমাজটা শেকলছেঁড়া, উদ্বাস্তু। জয়ি বলে, বিবাহিত জীবন এখন একটা বন্দোবস্তী। আমাদের জীবনটা সে রকম হয়ে যায় তা জয়ি চায় না। আমরা এ-ওর কাছে দবকারী আছি কিনা তা বোঝার জন্যে এই বিচ্ছেদটা দরকার।

—সবটা সত্যি নয় হে।

—কোনটা সত্যি নয়?

—জয়ি আর তুমি কি ঠিক করলে, সেটা এত ব্যক্তিগত ব্যাপার যে আমার কথা বলা সাজে না। বিচ্ছেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সেই স্বামী স্ত্রী পুনর্মিলিত হতে পারে? মনে হয় না। এই যে নীলার একটা মধ্যবিত্ত নৈতিকতা বোধ, এটা তো আমাদের চমৎকার বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আমিও কি পারছি ওকে বোঝাতে? অত সোজা নয়।

—ভয় দেখিও না কুণাল।

—তোমার চিরকালের গোলমাল তোমার স্বভাবে। কোনোদিন দেখিনি কোনো কিছুতে বিশ্বাস।

—আমি পলাতক; তাই বলবে?

—তুমি উদ্বাস্তু। বাস্তু হারালে মানুষ উদ্বাস্তু হয়। কোনো

কিছুতে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নেই যার, সেও উদ্বাস্তু। তোমার আমার প্রজন্মে, পরবর্তী প্রজন্মে, এমন বহু মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষ উদ্বাস্তু। বিশ্বাসের নোঙর নেই। ভেসে যাচ্ছে সব। অথচ বড় সত্য কথা মানুষ আদর্শ চায়, বিশ্বাস করতে চায়, শ্রদ্ধা করতে চায়।

—ভাবলে পরে কেমন লাগে।

—বাস্তবে নামো! প্রতিদিন মানুষ জমিজমা হারিয়ে উদ্বাস্তু হচ্ছে। দেশান্তরী মজুর হচ্ছে, এটা ঘটনা।

—আমিও পড়েছি কাগজে।

—এখন তো এ সব নিয়ে সমীক্ষা হয়, কাগজে বেরোয় তদন্ত-মূলক সমীক্ষা। মানুষ পড়ে, ভুলে যায়। শহরে বসে কাগজ পড়লে ওটা শুধু খবর বলে মনে হয়। কেউ মাথা ঘামায় না। অথচ প্রত্যহ ঘটনাটি ঘটে চলে। সন্দেশ খাও।

—তুমি খাও। এত মিষ্টি খাও কেন?

—আমার অসুখটা বড় অদ্ভুত। শরীরে চিনির ঘাটতি সব সময়ে। গরিবের ঘোড়া রোগ।

—স্কট ফিটজেরাল্ডের হয়েছিল।

—কার হয়েছিল?

—এক লেখকের।

—মারা গেছেন?

—বহু কাল। হেমিংওয়েদের সময়ের লেখক।

—পড়িনি। অবশ্য কি বা পড়েছি! এখন বাংলা ব্যাকরণ পড়ি, মিত্রাকে বোঝাই।

—ওরা ভালো আছে?

কুণালের মুখ আলোকিত হয়ে যায়।

—খুব ভালো। অনী তো ক্লাসে প্রথমই হয়। মিত্রাটা ফাঁকিবাজ ছিল। এখন বেশ মনোযোগী হয়েছে।

—খুব ভালো। নীলা কি বলে?

—ও নিজে মন ঠিক করতে পারে না, আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে

দেবে না। ওর ছেলেমেয়ে আমার অনুগত হয়ে যাচ্ছে বলে ক্ষেপে যায়, আবার আমি দেরি করে ফিরলে বলে ওর ছেলেমেয়েকে অবহেলা করছি। শেষ অবধি ওর ছেলেমেয়েকে বলেই রেজেস্ট্রি করতে হবে। কিন্তু সে তো একা করা যায় না।

—বড় জটিল পরিস্থিতি।

—নীলাও কষ্ট পাচ্ছে। আবুলের তুলনা নেই। আমাদের আরেকটা ঘর দিচ্ছে।

এই কুণালের কাছেই সোম গেল। কুণালের কোনো মামা আগে কম্যুনিস্ট ছিলেন, পরে ছেড়ে দেন, নামটাও সম্ভবত ভোলানাথ, এ রকম মনে পড়েছিল ওর।

আগে তাঁর কথা না বলে, সোম ওর কাজের কথাটি বলল। পুরনো দিনের পার্টি, তখনকার কাজকর্ম, এই সব!

কুণাল মাথা নাড়ল।

—ওই সময় বিষয়ে কিছু বলতে পারব না সোম। সত্যিই জানি না। জানলে বলতাম।

—তোমার এক মামার কথা বলতে না? তাঁর নাম ঠিকানাটা পেলে কাজ হত। ওঁর কথা রাম সেন বলেছেন।

—আমার সেই মামা? তিনি কি সক্রিয় আছেন বলে মনে করো? বয়স কত জানো? আশি হবে হয়তো। তিরিশ বত্রিশ বছর রাজনীতিকে গুডবাই করে সরে গেছেন। খুব স্বাস্থ্য শরীর ছিল। খাদ্য আন্দোলনে পুলিশ যা মারে।

—তিনি তো জানবেন।

—জানাই স্বাভাবিক। ছোটবেলা কমই দেখেছি। কৃষক ফ্রন্টের কর্মী, গ্রামে পড়ে থাকতেন। দিদিমা মাঝে মাঝেই মেজমামাকে খবর দিতেন, ভোলাকে ধরে নিয়ে গেছে। আমার বালক মনে ওঁর সম্পর্কে খুব কৌতূহল ছিল। দেশের কাজ করেন, জেল যান, কত না রোমাঞ্চ! তারপর যখন কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলাম, তখন

তো আমি আমার রাজনীতির আগ্রহে ডুবে আছি। রাজনৈতিক বিতর্ক করতে গেছি, সুবিধে হয় নি। মজা হল, ওঁর রাজনীতি যে আসলে একটা ভ্রান্ত, সুকৌশলী, ধার করা রাজনীতি, আমি সে কথা বলতাম। উনিও আমার রাজনীতিকে ঘোর সন্দেহের এবং এখন বুঝি যে উদ্বেগের চোখে দেখতেন। উদ্বেগটা, রাজনীতিটা ভুল, এবং ছেলেরা মরবে। তখন বুঝতাম না। এই রাজনীতির দর্পণে যে এটা প্রমাণ হয়, ওঁদের রাজনীতির মধ্যে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই নেই। তাতেও ওঁর ঘা লেগেছিল।

—কোনো যোগাযোগ নেই?

—কেমন করে থাকবে? আমি তো বাড়িই ছাড়লাম।

—থাকেন কোথায়?

—বনগাঁ থেকে ভেতরে গ্রামের নামও ভিতরগাছি। ছোটবেলা যেতাম, খুব ভালো লাগত। খানিক পথ বাসে, তারপর নৌকো চেপে ইছামতী ধরে যেতাম।

—ওখানে কেন আছেন?

—কেননা ওটা ওঁর দেশের বাড়ি।

—বেঁচে আছেন আশা করি।

—ভোলা মামা? বেঁচে থাকার কথা। ওঁর মতো প্রচণ্ড রকম জীবন্ত মানুষ আমি দেখিনি। গর্জন করে কথা বলছেন, পাকা কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছেন, তেল মেখে স্নান করছেন, খাওয়ার পর বহুক্ষণ ধরে গলা সাফ, মুখ ধোওয়া।

—পুরানো দিনের লোক!

—না না, ব্যাখ্যাটা অন্য জায়গায়। গ্রামে ঘুরে, তাদের সঙ্গে থেকে, জীবনের স্বাভাবিক ব্যাপারগুলোকে দামী মনে করতেন। নর্মাল মানুষ। ভালো করে স্নান করব, যা পাব পেট ভরে খেয়ে নেব, এগুলো মানতেন। এখন বুঝি, রাজনৈতিক জীবনে তাড়া খেয়ে ঘুরতেন, রোজ ভাত জুটত না, আশাও করতেন না। আর এটাও দেখেছিলেন যে সাধারণ মানুষ শেষ অবধি ওই চায়। নিজের

রোজগারে শান্তিতে থাকব। জীবন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হবে না। এখন হলে বলতে পারতাম যে বুঝেছি।

—ঠিকানাটা লিখে দেবে?

—অবশ্যই।

সোম ওঁকে চিঠি লিখল।

১৯৩০ থেকে উনি গ্রামে ঘুরছেন। মেদিনীপুর কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার একজন স্থপতি। বয়স তো আশির কাছে হওয়া উচিত। আর, এমন মানুষ বাড়িতে থাকবেন এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু ভোলানাথ দত্ত তেমন লোক নন।

জবাব এল, "বর্তমানে খুবই ব্যস্ত। আমার পত্র পাইলে তবে আসিবেন এবং জবাবী পোস্টকার্ড লিখিবেন।"

কুণাল বলল, আবার লেখো। কঠিন বুড়ো। এ বয়সে ওই গ্রামে কি নিয়ে ব্যস্ত কে জানে।

সোম আবার লিখল।

জবাব এল, "তেরো হইতে পনেরো সময় দিতে পারি। নচেৎ পরে দেখা যাইবে।"

কুণাল বলল, চলে যাও। আমার নাম চট করে বোলো না। দেখ, কি পাও ওঁর কাছে।

দেখবে, সোম দেখবে।

এই তো যাত্রা শুরু।

॥ ৪ ॥

শেয়ালদা থেকে বনগাঁ। তারপর বাসে পশ্চিমে। বাস থেকে নেমে ইছামতীর বুক দিয়ে নৌকো চেপে যাওয়া সোমের পক্ষে নিরুদ্দেশ যাত্রারই শামিল।

ইছামতী এখানে সরু, খানিক স্রোত আছে, জল দাম ও ঝাঁজিতে মাঝে মাঝেই ঢাকা। মাঝি ওকে ভিতরগাছি নামিয়ে দিতে গিয়ে বলল, পারমদন যাবেন না?

—না, সেখানে কি ?

—কেন, ফরেস বাংলো ? হরিণ আছে, সবাই বেড়াতে আসে।

—ওগুলো কি পাখি, অত বড় বড় ?

—শামুকখোল। তা ভিতরগাছি আপনি রিকশাতেও আসতে পারতেন।

ভিতরগাছি অত্যন্ত ভিতরের গ্রাম হলেও যথেষ্ট বড়। ভোলানাথ দত্তের নাম বলতেই সবাই দেখিয়ে দিল। বলল, দেখবেন, বাড়ির সামনে জোড়া কদম গাছ আছে। আর চারদিকে কদম আর কদম।

কদম্বেরি কানন ঘেরা বড় একতলা বাড়ি। বাড়ি পাকা, তবে জীর্ণ। এত কদম গাছ একসঙ্গে দেখা যায় না আজকাল।

ভোলানাথ দত্ত গেরুয়া লুঙ্গি ও গেরুয়া ফতুয়া পরে খোয়া ওঠা রোয়াকে বসে একটি লোককে ধমক দিচ্ছিলেন, সে শুনে যাচ্ছিল।

—বলে লাভ নেই, গাছ আমি বেচব না।

—কদম নয়, তেঁতুল গাছগুলো···

—কিচ্ছু বেচব না···আপনি ? অ। বুঝেছি। আসুন। না না, প্রণাম করবেন না। গেরুয়া দেখে ভয় পাচ্ছেন ? ময়লাটা বোঝা যায় না। আসুন।

ভেতরের ঘরটি বড়, জীর্ণ। একটি তক্তপোশ, চেয়ার দুটি, দুটো তাকে বই, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী ওষুধপত্র। ঘর পেরোলে দাওয়া। তারপর উঠোন। আরো দুটি ঘর, মাটির।

—কুয়ো ওদিকে, স্নান করুন। পায়খানা পিছনের বাগানে, কুয়ো পায়খানা। স্নান করুন, খাই, তারপরে কথা হবে। অ সুরো! দোখয়ে দাও না সব।

—আসুন! বলে একটি অপ্রসন্ন চেহারার প্রৌঢ়া বেরিয়ে আসে মাটির ঘর থেকে।

—স্নান করুন।

কুয়ো পাড়ে জল তুলে স্নান করা বড় আনন্দের। জলও চমৎকার।

ভিতরের দালানে খেতে বসে ওরা। ভোলানাথ বলেন, আমার এখানে দু'বেলা সেদ্ধ ভাত। ওই যে তেলটা খাচ্ছেন, ওটা খাঁটি। দধিমঙ্গল গ্রামে একজনের চাষ আছে। বাড়ির জন্যেও সরষে ভাঙায় আমিও কিনি।

—সেদ্ধ তো ভালো।

খেতে খেতেই ভোলানাথ সব দরকারী খবর দিয়ে দেন নিজের সম্পর্কে। তিনি দেশে আসার ফলে অন্য ভাইরা খুব খুশি। তারা আসতও না, দেখতও না। সুরো, ওর ছেলে বউ নাতিরাই থাকত, দেখত।

—জমি-টমি ছিলও না, বাড়ির সামনে আর পেছনে যা! আর তো কেউ আসবে না। ওরা এখন···মানে ভাইপো, ভাইঝি, সব সপরিবারে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, সুইডেনের বাসিন্দা। ভাইয়েরা কলকাতায় যে-যার ফ্ল্যাটে।

—আপনি একাই এখানে?

—একা বলতে পারেন না। শতখানেক গাছ এত বছরে লাগিয়েছি। ওরা আমার সঙ্গী। কদম গাছগুলো আমার দুর্বলতা বলতে পারেন ··মেদিনীপুর দুবগড়ে বনকদমের একটা বনই ছিল। কদমফুল পাকলে চুষে খেতে বেশ লাগে, টক অবশ্য, খুব টক।

—তাই বুঝি?

—সেজন্যে লাগাই নি। এমনিই। সামনে পিছনে মিলে দেড় বিঘা জায়গা, দুটো কাঁঠাল গাছও আছে। কাঁঠাল, তেঁতুল, সুরোরা বিক্রি করে। গ্রামের লোকরা মনে করে এটা আমার পাগলামি, মনে করুক। তবু তো কিছু গাছ দেখতে পেলেন, আজকাল যা দেখা যায় না।

—হ্যাঁ, গাছ তো আর নেই।

—সবাই বন কাটছে, নামে পুনর্বনসৃজন হচ্ছে। কার্যকালে গোল্লা। সরকারের বন মানে প্রধানত ইউক্যালিপটাস। নামে নানা গাছ, কাজে ইউক্যালিপটাস।

—বড় বিতর্কিত গাছ।

—যে যা করছে করুক। আমি এখন আর রাজনীতিতে নেই।

—পেনশান পান?

—তা পাই। কবে থেকে জেল··তা একুশ বছর সাত মাস তিনদিন জেল খেটেছি।

—কম নয়।

—গাছ, গাছের কথা ধরুন। গ্রামের লোক এখন বাড়ির গাছ কাটছে।

—টাকাব দরকারে।

—সবাই নয়। লোভও আছে। কিন্তু গাছ লাগা, গাছ না থাকলে বাঁচবি?

ভোলানাথ বড় কামড় দেন কাঁচা লঙ্কায়। তাবপর বলেন, আমাব কাছে কি জন্যে বলুন তো?

—আমাকে আপনি বলবেন না।

—ভ্যানটার বন্ধু বলে?

—ওর নাম ভ্যানটা?

—আমি তো তাই জানি। তবে যোগাযোগ নেই। আমার কাছে ওরা, এবং ওদের কাছে আমি মৃত বললেও হয়। ওরা বোনের গুষ্টি। আর ভাইয়ের গুষ্টির কথা তো শুনলেন। উচ্চাশার শরে দগ্ধ হয়ে ওরা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। পার্টিগুলির লাইনের মতো ওদের চিন্তাও আন্তর্জাতিক।

ভোলানাথ দত্ত হা হা করে হাসেন। বললেন, এ তো এখন ঘরে ঘরে। হচ্ছে হোক, যখন যে রকম, তখন সে রকম চলতে হবে। তবু দুঃখ হয়।

—কেন? মানে কি জন্যে?

ভোলানাথ গলা নামান, চোখের দৃষ্টিকে যথেষ্ট তীক্ষ্ণ করেন ও বলেন ভাইপো ভাইঝিদের বেলা উদারনীতিক পরিবার বেছে বেছে··· ফল? এ-পক্ষের ও-পক্ষের মেয়ের বাপ-কাকা-দাদা বিদেশে যাবার

প্যাসেঞ্জটি দিয়েছে বউ মেয়েদের। পণ নেয় নি কেউ। সবাই পণপ্রথা বিরোধী। আমার ভাইয়ের স্ত্রী তো এ নিয়ে এক সমিতিই গড়েছে।

—এই জন্য ?

—হ্যাঁ, দুঃখ হয়। আমরা মুখে যা বলি কাজে তা করি না। পণের অভিশাপ গ্রামে গ্রামেও। বছরে ক'মাস মজুর খাটে, তেমন ছেলেও টাকা, সাইকেল, ঘড়ি নেয়। উঠুন ভাল কথা, ভ্যানটা বিয়ে করেছে ?

—না।

—আপনি ?

—করেছি।

—ছেলে মেয়ে ?

—হয় নি।

—যাক, ঘরে চলুন আঁচিয়ে। আপনি কেন এসেছেন তা শোনা যাক।

—খেয়ে বিশ্রাম করেন না ?

সুরো বলে, আপনি এসেছেন বলে জ্যাঠা বাড়িতে। নইলে ওঁব পায়ে চাকা বাঁধা। যুবো ছেলেরা সাইকেল নইলে যায় না, আব উনি আড়ংঘাটা থেকে দধিমঙ্গল, চিতিপুর থেকে নালপাট, বাস পেলেন তো ভালো, নয়তো হেঁটেই মেরে দিলেন।

আশ্চর্য! ওঁর জীবনীশক্তির গোপন রহস্য কি? সোমের নিজেকে আবার অসম্পুর্ণ, আধখানা মানুষ মনে হয়।

ঘরে এসে ওরা বসে।

—আপনি ঘোরেন, মানে···কেন ?

—ভোলানাথের একক সংগ্রাম।

—কি করেন ?

—কান ধরে রথের মেলা থেকে গাছ কেনাই, নিজেও কিনে দিই, বনবিভাগের কাছ থেকে গাছ আনাই ওদের দিয়ে।

—তারপর ?

—যে যার বাড়িতে গাছ লাগাও, গাছ বাঁচাও। বললেই বেটারা শোনে না। ঘুরে ঘুরে দেখি, গাছ মরে গেলে ধমকাই।

—কেউ সহযোগিতা করে?

—কেউ বলতে তো পার্টি এবং পঞ্চায়েত। তারা সহযোগিতাও করে না, বাধাও দেয় না। তবে মানুষকে তো বোঝানো দরকার।

—বুঝছে?

—বুঝবে না কেন? গাছের পেঁপে আমড়া বেল কাঁঠাল বেচছে যারা, বুঝছে। আমি তো চেয়েছিলাম, পারমদনের মতো না হোক, বিঘা দশেক জমি দাও, একটা মিনি জঙ্গল তৈরি করি।

—দিল?

—কখনো দেয়? সেই জন্যেই নিজের বাড়িতে নানারকম গাছ বুনে···পুকুরটার চারধারে শুধু বাবলা লাগিয়েছি। বাবলাকে তুচ্ছ করবেন না।

—কি কাজে লাগে?

—এ দেশে জ্বালানি হয়। রাজস্থানে ওর নাম কল্পতরু। বাবলার ফলের যে ছড় নামে, তার দানা ওরা খায়, গরিববা।

—আপনি তো খুব বড় একটা কাজ নিয়ে আছেন।

—আমি মরে গেলে সুরোর ছেলেরা কি করবে কে জানে। এখনো শীতকালে পিছনের বাগানে সবাই পোষলা করতে আসে। একটু শোবেন?

—না। যে জন্যে এসেছি তা বলি।

ভোলানাথ খুব মন দিয়ে শোনেন। শুনতে শুনতে ওঁর চোখ ধূসর হয়ে যায়।

সোম বলে এবং একই সঙ্গে ওর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়। না, সব জায়গায় সব মানুষ অ্যারেঞ্জমেণ্ট বা বন্দোবস্তীর শিকার হয়নি। দীর্ঘকাল রাজনীতি করা এক বৃদ্ধ গাছ লাগিয়ে চলেছেন।

সব শুনে ভোলানাথ বলেন, বুঝলাম!

—আপনি তখনকার লোক···

—আপনি তো কিছুই জানেন না।

—রাম সেন কিছু কিছু বলেছেন।

—রাম সেন বেঁচে আছে?

—খুব সজোরে। কলকাতায় এলে আমার বাড়িতেই ওঠেন।

—সেই লেঠেল রাম সেন তো?

—হ্যাঁ শুনেছি খুব লাঠি চালাতেন।

—চালাতো মানে? দে-বাড়িতে কৃষকসভার উপব হামলা হচ্ছে, রাম সেনের দল কি লাঠি চালাচ্ছে। জেলে কত গেছে, তেজ মরে নি।

—ওঁকে আপনার কথা বলব।

—বলবেন। পরিচয় কিভাবে?

—আমার বাবা···আমার অবশ্য মনে নেই···তাঁব নাম ছিল অশোকবরণ চৌধুরী। তিনিও···

—আপনি অশোকের ছেলে?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে 'তুমি' বলা যায়।

—একশো বার বলবেন।

—অশোক! আমাদের চেয়ে কত ছোট! কিন্তু কত আগে চলে গেল। বড় ভালো কর্মী ছিল।

—আমার তিন বছর বয়সে···

—হ্যাঁ, বিয়েও দেরিতে করে···তোমার মা বোধহয়···মাকে বলে বা কি হবে! তার ওপরেও চাপ পড়েছিল খুব। তবে স্বামী-স্ত্রী সবাই রাজনীতি করত, সেসব পরিবারেই এখন কি পরিবর্তন! গ্রামে বসে দেখছি তো! এসব দেখে মনে হয়, সব ছেড়ে দিয়ে খুব ভালো করেছি। তুমি অশোকের ছেলে! মা কোথায়?

—মা নেই বেশ কিছুকাল।

—ইশ! দুঃখ পেলাম। যাক, স্ত্রী তো আছে।

—হ্যাঁ।

ওঁকে কেমন করে ওর ও জমির বর্তমান সম্পর্ক বোঝানো যায়? সোম বলল, আপনি কথা বলতে শুরু করলেই আমি টেপ করব।

—ওইটেতে? এ যে বড় ছোট।

—খুব কাজ দেয়।

—এখন অবশ্য চোরাচালানের কৃপায় গ্রামে ঘরে ঘরে ক্যাসেট-প্লেয়ার আর হিন্দী গানের হুজ্জতি। কেউ পারে না, লোকশিক্ষামূলক যাত্রাপালা ক্যাসেট করতে?

—করলেও লোক নেবে কি?

—তাও বটে। হিন্দী ছবি এখন···এটা বেশ শক্তিশালী?

—হ্যাঁ।

—বিজ্ঞানের কি অগ্রগতি দেখ। কিন্তু বিজ্ঞান যদি জনসেবায় না লাগে···চমৎকার জিনিসটা।

—এরকম একটা চান? তাহলে দেখব।

—না না, তুমিও যেমন! আমার সঙ্গে কথাবার্তা চলে আম জাম শিরীষ কদমের। সেসব গোপন কথাবার্তা তো রেকর্ড করাও যাবে না, কি বলো?

সোম রেকর্ডারে ক্যাসেট পরাতে পরাতে বলল, ওরা কি বলে আপনাকে?

—মানুষ ওদের শত্রু। ওরা বোধহয় বোঝে যে এই শত্রুর হামলা এখন ওরা আটকাতে পারছে না, কিন্তু ওরা যে ভাবে প্রতিশোধ নেবে, তা মানুষের ধারণাতীত। যত গাছ কাটা পড়বে, তত প্রকৃতি ভারসাম্য হারাবে, মার খাবে মানুষ।

সোম মনে মনে সায় দেয়। গাড়োয়ালী তরুণ পৃথ্বীবলের কথা মনে পড়ে।···প্রকৃতিকে ক্রমাগত ধর্ষণ করা হচ্ছে, বন ছিল প্রকৃতির লজ্জানিবারণ। প্রকৃতি একদিন শোধ নেবে। যেদিন জল থাকবে না, বৃষ্টি পড়বে না, জ্বালানি থাকবে না, খাদ্য ফুরাবে! সব জ্বলে খাক্ হয়ে যাবে।

—বলুন।

—দাঁড়াও, একটু আসি। গুছিয়ে বসতে হবে তো? জীবনে প্রথম···

—কখনো কেউ সাক্ষাৎকার নেয়নি?

—কে আসবে? কেন আসবে? বুড়োদের দিয়ে কার কি দরকার আছে আর? আরে, আমি তো কোন্ ছার। কতজনকে বলেছি রাম সেনের নাম। বলে কি, মরে গেছে। শোনো কথা! আজ তুমি না এলে···

বাগানে দরকারী কাজটি সেরে আসেন ভোলানাথ। জল খান কলসি থেকে। একটু যোয়ান মুখে দেন। তারপর তক্তপোশে গুছিয়ে বসেন।

সুরো ঘরে ঢোকে, আপনাকে চা দেব তো? জ্যাঠা খান না, আমার নেশা খুব।

ভোলানাথ প্রায় ধমকে ওঠেন, চা তো দেবেই, তখন মুড়ি নারকেল দেবে। আর, আমি নয় খাই না, ওকে কেন কষ্ট দেয়া? মাছ তো পাবে না। ডিম···

না, না, সেদ্ধভাত খেতে আমার খুব ভালো লেগেছে। এর স্বাদই আলাদা।

—খুব স্বাস্থ্যকর হে! মাটির হাঁড়িতে রান্না কাঠের জ্বালে। ওই জন্যেই তো পেটের রোগ জানি না। নাও, শুরু করো। তোমার রেকর্ডারটা আমাকে অবাক করে দিয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু আমিও তোমাকে অবাক করে দেব। ওই কি বলে না, ওল্ড ইজ গোল্ড! আমার কাছেও একটা···

—বলুন।

॥ ৫ ॥

রসুলের বই পড়লেই জানবে···

—কার নাম বললেন?

—তোমরা, এখনকার ছেলেরা কত কম জেনে দিন কাটাতে পারো! ভাবলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি, অসম্ভব ক্লান্ত। আমি আবদুল্লাহ রসুলের 'কৃষক সভার ইতিহাস' বইয়ের কথা বলছি।

—বলুন, আর বাধা দেব না।

—রস্থুলের বই পড়লেই জানতে পারবে ১৯৪৪ নাগাদ বাংলার অনেক জেলায় কৃষক আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে কৃষ্টি বাহিনী গড়াব কথা হয়। এ কাজে কৃষক সমিতিকেই আগাতে বলা হল, তারাই গ্রামগঞ্জের লোকশিল্পীদের যোগাড় করবে, তাদের প্রচলিত গানে নাচে নতুন ভাবধারা ঢোকাবে, অর্থাৎ তাদেরকে দিয়েই কৃষ্টিবাহিনী গড়তে হবে।

—গণসংগীতের জন্যে ?

—গ-ণ-সং-গী-ত ! গণের জন্য তৈরি, গণের গাওয়া যে সংগীত তাই তো হওয়া উচিত গণসংগীত ?

—হ্যাঁ।

—এখন সবই যেমন কৃত্রিম, গণসংগীতও তেমনি। গ্রামগঞ্জেও গান বাঁধবার, গাইবার বহু লোক আছে, তারা পাত পায় ? খবর পাই। তা' বাদে শহুরে ঢঙে কায়দাবাজি করে গণসংগীত গাওয়া হয় ! এখানে বসেও জানতে পারি। একটা মজার কথা বলি শোনো। ব্যাপারটা বুঝবে।

—বলুন !

—অরুণেশ্বরবাবু আমাদের মস্ত নেতা ছিলেন। খুব সৎ, খুব ভালো কর্মী, কিন্তু বক্তৃতা দিতে গেলেই তাঁর মুখ দিয়ে ভালো বাংলা বেরোত। গ্রামের কথা গেঁয়ো মানুষ বেশ বুঝত। তা তেভাগা তখন চলছে, দেশ ভাগ হয়নি, হাটচকে পবন রাণাকে মেরে ফেলল জমিদারের লোক।

—কোথায় হাটচক ?

—বাদা অঞ্চলে। তা আমরা তো সমিতি থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করেছি। অরুণেশ্বরবাবু খুব বলে যাচ্ছে, যাকে বলে কৃষকদের উপর কবে থেকে কিভাবে জুলুম হচ্ছে ··সবাই শুনছে। ওনার বলা শেষ হতে আমরা তো পবনের বাপকে তুলেছি, তুমি বলো ! সে কি বলল জান ?

—কি ?

গলাটাও হেঁড়ে ছিল, চেহারা রোগা মতো। সে হেঁকে বলছে সেই লেঠেল রাম কোথা ?. তিনি এসে আমাদের বাংলায় বলুক এই কমরেট কি বলল, তা বাদে আমি বলব। বোঝ ! রামের কথা বাঙাল টান, তবু সে এমন সহজে বলতে পারত যে সবাই বুঝত।

—তারপর ?

—লেঠেল রাম তো সিধে কথায় সব বুঝিয়ে দিল। কথা সামান্য হে ভাইরা! জমিদাবে পুলিশে স্বামী-স্ত্রী, হুয়ে চিরকাল চাষীকে মারছে বিদেশী সরকার আইন করছে লোক দেখানো তা এখানে আমাদে ভাইকে মেবেছে, আমরা লড়াই ছাড়ব না, ফিরে মারব, শোধ নেব।

—বাঃ !

—তারপর পবনের বাপ বলছে, আমার বেটা, গেছে, তাকে আ পাব না। যে হেদো নুস্কর হতে এমন সর্বনাশ হল, এখন যেয়ে সমি থেকে একজোটে তার সর্বস্ব ধান কাটতে হবে, সমিতি আপি রাখতে হবে, তা বাদে ভাগ।

—এত পরিষ্কার করে বলল ?

—বলবে না কেন ? পবনের বাপ বলবে না তো কে বলবে সে তো ভদ্র ঘর থেকে বই পড়ে রাজনীতি করতে যায় নি। জমিদার মহাজনের অত্যাচার সয়েছে, কৃষক সমিতিতে যোগ দিয়েছে দিনে দিনে সে বুঝেছে, অত্যাচার সয়ে চললে অত্যাচার থামবে না আর দেখ ! সে সময়ে মা, বউ, ছেলে, মেয়ে সকলকে নিয়ে কৃষ আন্দোলনে নেমেছে, কি রকম বোঝ ?

—আন্দোলনের জোয়ারে এই মনোবল ?

—আরে, ধান তার জীবন, ধানের জন্য মাটির জন্য তার আন্দোলন। তেভাগা তার জীবন। সে তো সর্বস্ব বাজি রেখে নেমে পড়েছে। এটা তার সংগ্রাম, তাতেই সে জোর পাচ্ছে। আর আমরা ? তখনো দেখেছি, এখন তো দেখিই। যে নিজেরা রাজনীতি করেছে, বাড়িতে চলছে অরাজনীতিক ভাবধারা।

—তখনো এ রকম ছিল ?

—ছিল। তবে এখনকার কথা ভুল করলাম। এখন আর রাজনীতি নেই। রাজনীতির নাম সুবিধাবাদী নীতি, এখন ঘরে বাইরে সব এক হয়ে গেছে।

—গ্রামের কৃষক ছিল অন্য রকম ?

—আন্দোলনে নামার পর সে পিছনে হটে নি। আর, নেমেছে সকলকে নিয়ে। আন্দোলনে নামালাম আমরা, দাম দিল ওরা! এইজন্য সকল বড় গ্লানি, বড় পাপ বোধ।

ভোলানাথ শিশুর মতো আন্তরিকতায় বলেন, গাছ বুনি, লালন করি, তাদের কাছে ক্ষমা চাই। কর্মক্ষেত্রে তো যাই না আর।

—পবনের বাবার কথা বলছিলেন।

—হ্যাঁ। এই সত্য জীবন দিয়ে দেখলাম যে, আমার দেশের সাধারণ মানুষ, নিরক্ষর হতে পারে, স্বল্প শিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু সে অশিক্ষিত নয়। সে সব বোঝে, তার সভ্যতা আছে, সংস্কৃতি আছে, অত্যাচারীর স্বরূপ বোঝে। সংগঠিত হতে পারে না সব সময়ে। যেটা সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করলাম তখন থেকে আজ,—বাম রাজনীতির নাম নিয়ে গেলাম আর পিঠে চাকু মেরে সরে এলাম। এই হল বার বার,—আন্দোলনে নামাই, পার্টির উপর নির্দেশ আসে, পার্টি ফিল্ডের কর্মীদের নির্দেশ দেয়, কৃষক কেমন করে বাঁচবে তা না ভেবে আমরা পিঠ বাঁচালাম। কৃষককে বিশ্বাস রাখতে দিলাম না। এ সব পাপ হয়েছে, তার পরিণামও দেখছি।

—অপারেশন বর্গা তো হয়েছে।

—প্রচারে যা, কাজে তত হয়নি। আর, এখন ভাবি, বর্গাদারী প্রথা তো মধ্যযুগীয়। কংগ্রেস আইন করল, এরা চালু করল ঠিকই। কিন্তু প্রথম যা বুঝি, জমিমালিক চাষ করে না, চাষে খরচ করে না, লাঙল হাতে ধরে না, অথচ শস্য নেয় এটা কেমন প্রথা? আবার তার বাস্তব চিত্র দেখ। বড় জোতের মালিক রাজনীতিক মদতে বেরিয়ে যায়, দেড় বিঘা যার তার জমিতে বর্গা বসে। তোর ভিটায়

ঘুঘু চরায়, আজ এ প্রবাদের গ্রামক্ষেত্রে রূপান্তর, তোর জমিতে বর্গা বসাব।

—অথচ আমি ভেবেছিলাম এটা ভালো কাজ। বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

—ভাব নাই, ভাবে না এখন মানুষ। যা পড়ে তাই বিশ্বাস করে। মৌলিক চিন্তা করে স্বাধীন সিদ্ধান্তে কেমন করে পৌঁছাবে এই প্রচারের যুগে? তোমাকে যা ভাবায়, তুমি তাই ভাব। কেন না মানুষ এখন চিন্তা বিমুখ, প্রচারের যুগ। যাদের কার্য সিদ্ধি করবার, তারা এভাবে কায়দা ওঠায়। মানুষ বুঝে না। অশিক্ষিতের নতুন সংজ্ঞা, তথাকথিত শিক্ষিত যারা তারাই অশিক্ষিত।

—গ্রামে আপনার অন্য অভিজ্ঞতা?

—লেঠেল রাম বলত, আমরা শিখাতে আসি, শিখতে আসি না। এটা আমাদের প্রথম ভুল। এরা তো শিখিয়ে দিতে সক্ষম। ঠিকই বলত। গ্রামে যাও, শিক্ষা দাও, কিন্তু তার কি দেবার আছে, সে শিক্ষা গ্রহণ করো। সে অনেক জানে।

—যা আমরা জানি না।

—যেন একটা মহাদেশ আবিষ্কার হয় নাই, সেটা আছে জেনেই সেটাকে আণবিক বোমা ফেলে ধ্বংস করা হল। গ্রামের গান, গাথা, সংস্কৃতি, আমরা আবিষ্কারের চেষ্টাই করলাম না। আমাদের জাবজ সংস্কৃতির বোমা ফেলে সেগুলি ধ্বংস করলাম।

—আপনি কত ভেবেছেন!

—ভাবি, খুব ভাবি। যেটাতে বিস্ময় লাগে, তখন কম্যুনিস্ট পার্টি বলল, গ্রামের সংস্কৃতি গণসংস্কৃতি। তাদের সাংস্কৃতিক ফ্রণ্ট গড়াও। তাদের হাতে ছেড়ে দাও।

—সেটা তো করে নি।

—না। সে কাজ করল না। কেন করল না তাই ভাবি। গ্রামীণ সংস্কৃতির একটা বিশাল নতুন জাগরণ হতে পারত। তাদের গান, পালাগান, পটুয়া সংগীত, একটা নতুন চেহারা নিতে পারত। পার্টি তা করল না।

—তারা পারত, তাই না?

—তারা সে কথা বলত?

—বলবে না কেন? আমার দেশের মানুষ ঠিক ব্যাপারটা ঠিকই জানে। তখনো জানত। ব্যর্থ হয়েছি আমরা। তা এখনকার গণসংগীত যা হয়েছে, তাতে গণও নেই, সংগীতও নেই।

—তখনকার গণসংগীত···

—ভুল, ভুল তোমাদের। এ ভুল চিরকালের শিক্ষিত সমাজের। সেই পণ্ডিত আর মাঝির গল্পের মতো। মাঝি বেদবেদান্ত জানত না, কিন্তু ঝড়ে বোট মারা পড়লে সাঁতার কাটতে জানত। পণ্ডিত তা জানত না।

—আপনি বলে যান, আমি বাধা দেব না।

—গণসংগীত বলতে যদি এই বোঝায় গণের রচিত সংগীত, তাহলে এ ধারণাই তো ভুল যে গণসংগীতের ব্যাপারটা আমরা আনলাম।

—আপনি বলেছেন, ছিলই।

—নিশ্চয় ছিল।

গভীর বিশ্বাসে ভোলানাথ বলেন, কবে আমার দেশের সাধারণ লোক গান বাঁধেনি? তুমি ধীরেন বাস্কের বই পড়ো, "সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস", দেখবে যে জমিদার পুলিশ সরকারের জুলুম নিয়ে ওরা কত আগে কত গান বেঁধেছিল। কই, জিগ্যেস করলে না?

সোম ঈষৎ হেসে বলে, আমার অজ্ঞতা অপরিসীম। কিন্তু আপনি যা যা বলেছেন, সবই তো টেপে ধরা থাকছে।

—সাঁওতাল বিদ্রোহের সিধু কানুকে নিয়ে তখন তো বটেই, এখনো গান হয়, ওরা গায়। তখন তো ওদের লিপি ছিল না, কে বা লেখে। তবু অনেক সংগ্রহ হয়েছে। মেদিনীপুরে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে, পুরুলিয়াতে আমি এমন কত গান সংগ্রহ করেছিলাম। ওদের ভাষায় বাংলা লিপিতে, অনুবাদও করে নিয়েছিলাম। মস্ত খাতা হয়েছিল।

—খাতাটা কোথায়?

—সে কথায় পরে আসছি।

—এখন ওদের লিপি হয়েছে।

—হ্যাঁ, ওল্‌চিকি। তবে···

—কি ?

—কি জানি, বর্তমান সময়ের ল্যাজামুড়ো বুঝি না কিছু। এ লিপিতে দামী দামী বই ছেপেছে সরকার। ভাষা শেখার বুঝি কোনো ব্যবস্থাও করেছে।

—মেদিনীপুরের সঙ্গে যোগাযোগ আপনার আছে ?

ভোলানাথ চোখ মিচকে হাসেন। বলেন, পরে। বলেছি না অবাক করে দেব।

—বলুন।

—দেশের মানুষ কবে গান বাঁধেনি, গান গায়নি ? খুলনা-শোভনার কৃষক নেতা বিষ্ণু চ্যাটার্জি, ধানীবুনিয়ার কৃষক সমিতির সর্দার হীরালাল বাইন, এদের নিয়ে কত গান ! যদি কেউ সেগুলো সংগ্রহ করে রাখত ! করেনি নিশ্চয়। আমার বক্তব্য, এ কাজ গণকবিয়ালরা চিরকাল করেছে। তেভাগার সময়ে···ডিমলার এ গানটা :

'চাষার অক্ত পানি করিয়ে
দেশে হইল সোনার ধান, সেও ধান লইয়া যায় তোমার
দুষ্ট গভরমেণ্ট—'

সবটা আমার মনে নেই। কৃষক-আধিয়ার ক্ষেতমজুর বলো, সাধারণ গরিব মানুষ, তারা চিরকাল দেশে বান-বন্যা, আকাল, জমিদারের অত্যাচার, সাম্প্রতিক কোনো আন্দোলন, এ নিয়ে গান বাঁধে, গায়। মুর্শিদাবাদে যাও, ভালো আলকাপ শোনো, বোলান শোনো, এসব কর্ম অন্যত্রও আছে। দেখবে ওদের গানে কিভাবে বান, খরা, সরকারি রিলিফ, পণপ্রথার জুলুম, এ-সব তথ্য আছে, প্রাণ আছে। এই যে প্রচণ্ড শক্তিশালী ফর্ম, তাতে রাজনীতিক কনটেণ্ট যোগ হলে কি ব্যাপারটা দাঁড়াত। এগুলোই প্রকৃত গণসংগীত। এদেরকে কে মঞ্চে তুলছে, সভায় ডাকছে, এরা যাতে খেয়ে পরে বেঁচে থাকে সেটুকু কে দেখছে বলো ?

—সত্যি।

—ধান্দাধাউড়, যাদের সঙ্গে মাটির বা মানুষের কোনো যোগ নেই, তারাই করে খাচ্ছে। গণসংগীতের নামে এমন জিনিস শোনাচ্ছে, যার সুর কথা বিষয়বস্তু, কিছুর মধ্যে হেলো চাষা নিজেকে পায় না। অথচ মুর্শিদাবাদের কাশেম যখন গায়!

আটাত্তরে বন্যা এল
দেশ ঘর ভেসে গেল
খয়রাতিতে বান ডাকিল ভাই।
তেলা মাথায় তেল পড়িল
রুখো মাথা ফেটে গেল
কাশেম বলে!
বিবি বিটি নিয়ে কোথা যাই,
কাশেমের তরে আল্লা!
গাছতলাও যে নাই!

এর মধ্যে সব থাকে কেন না এ অভিজ্ঞতা বহু জনের। এরা কোথায়? কে এদের খোঁজে? এ গান তো গণসংগীত নয়! গণসংগীত হল এখন…রেকর্ডার বন্ধ করো।

সোম চমকে যায়, বন্ধ করে।

সুরো একটি থালায় চা মুড়ি নারকেল আর বোঁদে নিয়ে ঢুকল। বলল, টাটকা ভাজা, তাতেই…

—এত!

ভোলানাথ বলেন, খাও খাও! আমার খাদ্যও আসছে।

বড় বড় চার টুকরো বেলের মোরব্বা। খেয়ে ভোলানাথ বলেন, অরুণেশ্বরবাবুর বউ খুব ভালো জানতেন। করে করে পাঠাতেন। বেলের শুঁট, বেলের মোরব্বা, ওঁর ছিল আমাশা। গেলেনও সেই রোগে। তা মহিলার মনোবল ছিল বটে। ওই আচার, জেলি, মোরব্বা, বড়ি বিক্রি করে করেই জীবন কাটালেন। বাড়িটা

ছিল ছোটখাটো। ছেলেমেয়ে ছিল না। বাড়িটাও গেল মায়ের ভোগে। উনি মরতেই নানা দাবীদার জুটে গেল।

—আমার মাও করতেন।

—মোরব্বা ?

—সবই। ওঁর বেজায় ভয় ছিল, আমি বাইরের রান্না বা খাবার খেলেই অসুখে মরে যাব।

আরো অনেক বাতিক ছিল। সেসব বলে লাভ নেই। সোমের মনে হল, বাবাকে যেমন জানে না, মাকেও জানে না। কেননা মা তাঁর বিবাহিত জীবনে, স্বামীর রাজনীতিক জীবন, কোনো বিষয়ে কোনো কথা বলতেন না।

বলতেন, ও নামও কোর না। তোমার বাবা ওসব করতে গেছলেন বলেই সংসার বলো, আমি বলো, কারো ওপর সুবিচার করেন নি, জেনে রেখো।

—এই ফ্ল্যাটটা !

—হ্যাঁ, তোমার বাবার স্ত্রী হিসেবেই পেয়েছি। কিন্তু…

জয়ি বলত, আসলে তোমার মায়ের কোনো সাধ-আহ্লাদ মেটেনি। তাতেই ও রকম হয়ে গিয়েছিলেন।

—তাই হবে।

কুণাল বলত, তা নয়। (সব কথাই কুণাল সে সময়ে এমন আক্রোশে বলত, যেন প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়ছে। এখন বলে না) তোমার বাবা, তখনকার এবং চিরকালের বহু মধ্যবিত্ত পার্টি ওয়ার্কারেরা ভুলই করেছিলেন। স্ত্রীকে নিজের বিশ্বাসে বিশ্বাসী করেন নি।

এখন কুণাল বলে, বুড়ো-আধবুড়ো যুবক রাজনীতিক লোকরা কত গিয়েছে বলো তো ? তারাও পকেট গোছানোতে বিশ্বাসী, পরিবারগুলোও তাই।

কুণাল ওর মামা ভোলানাথকে দেখলে কি বলত ?

—খেয়েছ ?

—খেলাম।

—চলো খানিক হেঁটে আসি। টর্চটা নিও। আমার বুঝলে? হাঁটাহাঁটি করা অভ্যেস।

সুরো বলে, রজত মিরধা এলে কি বলব?

—বলবে প্রতিটি গাছের গোড়ায় আলকাতরা লেপে দিতে। বলবে, আমি যেয়ে দেখব।

হাঁটতে হাঁটতে বলেন, রজত মিরধা প্রথমে পেঁপে গাছ লাগায়। তারপর আম, কাঁঠাল। আমি খুব বাবলা লাগাতে বলছি পুকুর ঘিরে। এটা বালিচক অঞ্চলে দেখেছিলাম। আশ্চর্য! মানুষ কিভাবে বাঁচার ব্যবস্থা করে নেয়। বনাঞ্চল নয়। বাবলা থেকে জ্বালানিটা পাচ্ছে।

হেঁটে হেঁটে ওঁরা ইছামতীর পারে চলে যান। ভোলানাথই কথা বলে যান। এসব জায়গায় নীল চাষ হত তো, নীলের কুঠিও ছিল বিস্তর। সেসব কুঠিয়ালদের বাড়ির হাতায় কি সব গাছ ছিল! মেহগনি, শিরীষ, কৃষ্ণচূড়া। মেহগনিই অনেক। এখন একটা বড় গাছ দেখতে পাই না।

—আপনার তো আছে।

—আছে, মহীরুহ নেই। গাছ মহীরুহ হতে যত বছর দরকার··· তবে বর্ষা এলে একবার এসো। আমার ওই অতগুলো কদম গাছে যা ফুল ফোটে! পিছনে একটা শ্বেতচাঁপার গাছও আছে। বগুড়ায় খুব দেখতাম।

—আবার আসব তো বটেই।

—দেখ! কাজ ফুরোলে সাধারণত কেউ আসে না।

—আরো লোক এসেছে?

—না, এমন করে জানতে কেউ আসে নি। আজকাল তো জানতে চাওয়ার যুগ নয়। রাম সেনকে দেখতে কেউ যায়? আমি, রাম, আমরা না হয় কেউ নই। কিন্তু উনিশ বছর বয়স থেকে দেশের জন্যে জীবনটা দিয়েছি তো বটে! যাক! আমরা কেউ নই। কংসারি হালদারকে দেখতে কেউ যায়! সে মানুষ ছিল কিংবদন্তী। আণ্ডার-

গ্রাউণ্ড অবস্থায় সর্বাধিক ভোট পেয়ে লোকসভায় জেতে। কাকদ্বীপ তে ভাগার সে এক নায়ক। তার জীবন কথা আজকের মানুষ জানে?

—আপনার জীবনীও আপনার সঙ্গে হারিয়ে যাবে?

—নিশ্চয়। তাই তো আমি চাই। আমি তো পার্টি ভাগ হওয়ার আগেই সব ছেড়ে দিই। আমার অতীত আমারই থাক। আর কাউকে বলতে যাব না। কাউকে না। তোমাকে যেটুকু বলছি···

—বাবার জন্যে।

—হ্যাঁ, সে জন্যেও। তাছাড়া যে জন্যে এসেছ, সেটাও আমার ভালো লেগেছে। কেন না···দীর্ঘকাল একটা মহামূল্যবান ব্যাপার বয়ে বেড়াচ্ছি, সেটা···

—আর এগোবেন?

—না, চলো ফিরি।

—এখানে আপনাকে কেউ জানে?

—ক্ষমতাসীন দল জানে।

—অন্যেরা?

—তারা জানে বাবু স্বদেশী করত, পেনশন যখন পায়। আর জানে গাছপাগলা ভোলানাথ বলে।

—দধিমঙ্গলে একটা সাঁওতাল পল্লী আছে। খুবই বদলে গেছে অনেকে। তবে গাছের ব্যাপারে ওরা খুবই উৎসাহী। চলো। গ্রামে এই একটা অসুবিধে, সাপের ব্যাপার।

—অনেক?

—বর্ষায় বেশি দেখা যায়। আমার বাড়িতেও দেখেছি। রাম সেন তো বলত নরে নাগে বাস করতে অইব। এইটা নিয়ম। মারতও অঢেল।

ফিরে আসে ওরা। সুরো বলে, এ বেলাও কি উনি সেদ্ধভাত খাবেন?

—নিশ্চয়। আর কি খাবে? শোনো সোম, নির্মলকুমার বসুর

নাম তো জানো। উনি ভারি চমৎকার একটা গল্প বলতেন। গান্ধীবাদী ছিলেন, কোথায় যেন আশ্রম হচ্ছে। তা তাতে ঢোকার জন্যে প্রচুর লোক আসছে। কিন্তু নির্মলদারা ওদের বুঝিয়ে পারতেন না আশ্রম জীবনে কত কষ্ট সইতে হবে। তখন নাকি প্রথম তিন দিন, নিমপাতা, শুধু নিমপাতার ঝোল আর ভাত চালাতেন। দেশের জন্যে জীবন দিতে ওরা রাজী, কিন্তু ওই খাদ্য খেয়ে অনেকেই নাকি পালাত।

—কোথাও লিখেছেন ?

—তা বলতে পারি না।

—আপনি সেদ্ধভাত খাওয়ালেও আমি নড়ছি না।

—এই তো আজকের দিনটা আর কাল। পরশু থেকে আমাকে পাচ্ছ না। শুনছি আশাবাড়িতে সুদেব মণ্ডল নিজেই নার্সারি করবে। ওখানে যেতে হবে। বনবিভাগ তো সব সময়ে চারা দিতে পারে না। সুদেবের নার্সারিটা···আরে ! আমাদের এ অঞ্চল থেকে দুটো ছেলে গিয়ে দুমকার দিকে না রাজমহলে ষাট বিঘা জমিতে নয়নতারা চাষ করছে। কোন্ ওষুধ কোম্পানি না কি ওই গাছের শিকড় নিচ্ছে ওষুধের জন্যে।

—কত কি হচ্ছে, জানিও না।

—ও ছেলে দুটোর হবে। জেদ প্রচুর।

—এখন বলবেন ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার তো তাড়া আছে। দাঁড়াও, পা ধুই, বাইরে থেকে আসি। তুমি গেলে টর্চ নিয়ে যেও। সুরো তার বাইসন বেঁধেছে কি না দেখি।

—বাইসন ?

—বাচ্চা একটা মাদী মহিষ, আমিই কিনে দিই। তা তিনি দিনে দিনে চেহারায় হাতি, মেজাজে বাইসন হয়েছেন। সুরো বলে, গোপালী ! আমি বলি বাইসন। তা ওটা কাজের কাজ করেছে। দুধ বেচে অনেক। এখন এ মোষের খাইখরচা যা···সুরো বলে, বেচে দেব।

সোম সুরোকে বলে,—তুমি ওকে বেচবে ?

—না না, তাই পারি ?

—সেটা কোথায় ?

—আমার কদম্বেরি কানন পেরিয়ে তাঁর ঘর। সুরো ওকে কত নামে না ডাকে, গোপালী ! দুলালী !

সুরো হেসে বলে মেয়ে নেই, ও যে মেয়ে গো !

—ভালো মেয়ে। মাকে দেখছে।

দরকারী কাজটি সেরে, পা ধুয়ে ওরা এসে বসে।

লণ্ঠন জ্বলছে। পুরনো হলেও পরিষ্কার ঘর। সুরো বলে, বারান্দার কোণে জল থাকবে, মগ থাকবে। রাতে ওখানে যাবেন। উনিও যান।

এখন সোম বোঝে, গাছপালা ধোওয়া বাতাসে কেমন একটা অন্যরকম গন্ধ।

—টেপটা খানিক চালাও, শুনি। তাহলে খেই পাব।

খুব মন দিয়ে শোনেন উনি। বলেন, কোনো গান যে গেয়ে শোনাব, তা পারি না। এ গলায় গান কখনো বেরোয় নি।

—এবার বলবেন ?

—হ্যাঁ। এটা তোমায় বোঝাতে পেরেছি, যে আমরা গণসংগীত বলে চেঁচাবার আগেই চিরকালই, গণও যেমন আছে, সংগীতও তেমনি আছে।

—চল্লিশের দশকে একটা জোয়ার তো এসেছিল।

—হ্যাঁ। আমরা বুঝেছিলাম, এ জিনিসের ক্ষমতা কি ! অনেক গানও হয় নিশ্চয় তখন।

—কিছু মনে পড়ে ?

—মন্বন্তরের সময়ে হরিপদ কুশারীর 'মরণ শিয়রে দলাদলি করে কেমনে বাঁচিবি বল্'···মনে পড়ে ··'নবান্ন' নাটক আমি দেখিনি···তখন মেদিনীপুরে···শুনেছি গানটা 'ও হোসেন ভাই দামুক দিয়া চাচা'··· মঞ্চে গানটা কে গাইতেন ? জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র না বিজন ভট্টাচার্য

নিজে? আমাদের শুনিয়েছিল ভবেন দাশ। আরো নাম মনে পড়ে ...রমেশ শীল...হ্যাঁ, এঁদেরকে ওই সময়ের সঙ্গে খুব মনে পড়ে। মনে রেখো, আমরা গ্রামে কাজ করতাম, গ্রাম নিয়ে পড়ে থাকতাম।

—হরীন্দ্র চ্যাটার্জি?

—শুনেছি।

—হেমাঙ্গ বিশ্বাস...সলিল চৌধুরী!

—এঁদের গানও খুব...কিন্তু আমি যা বলতে চাইছি, তা হল... আমার দেশের মাটিতে শুধু সুরের বৈচিত্র্যে নয়, বিষয়বস্তুর ওপরেও গুরুত্ব দিয়ে গান রচনার ঐতিহ্য একটা ছিল। এই ঐতিহ্য যে খুব বড় হাতিয়ার হতে পারত, সে কথা মনে রেখেই পার্টির সাংগঠনিক পত্রে বলা হয়েছিল, কৃষক আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে কৃষ্টি-বাহিনী সংগঠন করতে হবে? লক্ষ্য করুন কেন তা করতে হবে! কেন না তখনি দেখা গেছল বাংলায় অনেক জেলাতেই কৃষক আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবেই গান, জননাট্য, নাচ, এসব হচ্ছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ওই স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেখে তবে কৃষ্টিবাহিনীর কথা বলা হয়। এটাও বলা হয় যে কৃষকদের মধ্যে, গ্রামে গ্রামে, প্রচলিত নাচ গানকে পরিবর্তিত ও সংশোধন করে বা নূতনভাবে রচনা করে প্রধানত কৃষক, গ্রামবাসী, এঁদের মধ্য থেকে শিল্পী সংগ্রহ করে তাঁদের দিয়ে কৃষ্টিবাহিনী চালালে, তবে তা কৃষক আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উপযোগী হবে। এর মধ্যে আমার বক্তব্য আছে।

—আপনার বক্তব্য কি আছে?

ভোলানাথ একটু বিপন্ন এখন, এখন অসহায়। পিছনে ফিরে তাকাচ্ছেন, নিজের মুখোমুখি হচ্ছেন।

সোমের শুধু মনে হচ্ছে, উনি নিজেই একটি বিশাল গাছ। কোন কবিতায় পড়েছিল, একটি বিশাল গাছ মাথা যার আকাশে ঠেকেছে।

যে গাছের মাথা আকাশে ঠেকে, হায়, পশ্চিমবঙ্গের ভূপৃষ্ঠে তেমন গাছ কেন এত বিরল? এখনকার সংকীর্ণ, বামনাকার মানুষ ও

রাজনীতি কি মহীরুহদের আর সহ্য করতে পারে না? বিশাল উন্নত শাল, প্রাচীন মেহগনি, সব কেটে ফেল, কেটে ফেল।

তেমনই অসহ কি বিশাল মাপের মানুষকে সহ্য করা? কেউ কাজের কাজ করলে তাকে ছোট করতেই হবে?

অথচ এখন সোম বুঝতে পারছে, ভোলানাথ যেমন, রাম সেনও তেমন মহীরুহ, মাথা যার আকাশে ঠেকেছে। মহীরুহ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, কেন না তার শিকড় মাটির গভীর হতে গভীরে চলে যায়।

রাম সেন ওকে বলতে পারেন, যাও আউগাও, ভয় কি? আর ভোলানাথ কোন ক্ষয় ঠেকাবার জন্যে ঘুরে ঘুরে মানুষকে গাছ লাগাতে বলছেন, গাছের সন্ধানে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন?

ওঁরা পারেন, কেন না রাজনীতি করার সময়ে যেমন মানুষের মধ্যে ছিলেন, বিশ্বাসের শিকড় যেখানে চলে গিয়েছিল, সেখানে দল ভাগ, দলবাজি, সংকীর্ণতা থাকে না। আজও ওঁরা পারেন, কেন না প্রাচীন সততা আজও হারান নি। সুখে দুঃখে মাটির সঙ্গেই আছেন।

দেশে এমন মানুষ আরো আছেন নিশ্চয়। বিরল হলেও। এ রাজ্যের ভূপৃষ্ঠ থেকে সব মহীরুহ নিশ্চিহ্ন হলেও মানুষের মধ্যে হয়তো থেকে যাবে, আবার আসবে।

বড় মাপের মানুষ, নিঃস্বার্থ মানুষ, তেমন মানুষকে চিরকাল দেশ চাইবে। শ্রদ্ধা করা যায়, মাথা তুলে দেখতে হয়, এমন মানুষের প্রয়োজন নিশ্চয় থাকবে। সব বন্দোবস্তী নয় জমি, সব অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে যায়নি। আছে, আছে কোথাও।

ভোলানাথ কি ভাবছেন?

—রেকর্ডার অন্ করো। আমি থেমে গেলে তুমি ওটা বন্ধ করো, দেখেছি।

—ক্যাসেটটা পাল্টে নিই।

—এরপর? ক্যাসেট শুনবে, লিখবে?

—হ্যাঁ।

—ধৈর্যের কাজ।

—সম্ভব হলে রাম সেনকে একবার নিয়ে আসব।

—লেঠেল রাম, লেঠেল রাম! তার সঙ্গে দেখা হবে! হবে কি?

—দেখি না।

—যাক, যে কথা বলছিলাম···বলতে যেয়ে তোমার বাবার কথাও মনে হল···যে ভাবে মারা যায়···

—কি ভাবে?

—কেন, কাশীপুর ক্যাম্পে শিশুরা মরছিল খাদ্যাভাবে, অসুখে। সেখানে যাওয়া ওর ঠিক হয়নি।

—কেন?

—সে তো কলকাতায়, কর্মীদের খাবার ব্যবস্থা, শেলটারে সাহায্য পৌঁছানো, এসব করত। ওদিকে কাকদ্বীপে, উত্তরবঙ্গে অন্তত দু-এক জায়গায়, তেভাগা খুব জঙ্গী রূপ নিয়েছে।

—বাবা?

—রাতদিন ঘুরে ঘুরে দেহে কিছু ছিল না। কাশীপুরে খুব লাঠি চলে। মাথায় লাঠি খেয়েই···ব্রেন হেমারেজ···হাসপাতালে··· যখন জানলাম!

সোম আস্তে বলে, আমি চিরকাল জানতাম বাবা অসুখে মারা গেছেন।

—মা বলেন নি কখনো?

—না।

দুর্বোধ্য, দুর্বোধ্য। বাবা তো ভীতু ইঁদুরের মতো মরেন নি। মা'র কাছে কি সেটা যথেষ্ট সম্মানজনক মৃত্যু বলে মনে হয়নি? কিংবা অন্য কিছু?

মা'র কণ্ঠস্বর মনে পড়ে, তোমার বাবার কুড়ি বছর, আমার পনেরো, বিয়ে হল। এক বছর বাদ থেকেই উনি রাজনীতিতে চলে

গেলেন। ন' বছর বাদে তুমি হলে। ওঁর তখন উনত্রিশ। ওঁর বত্রিশ বছর বয়সে তো মারাই গেলেন।

বিবাহিত জীবন বারো বছরের। প্রথম বছরটা বাদ দিলে বারোটা দিনও ওঁকে কাছে পাইনি।

সে জন্যে কি ক্রোধ ছিল মনে? সোম শুনেছে, ওর জন্মের আগেই মামাদের চেষ্টায় মা মাট্রিক পাস করেন। বাবার মৃত্যুর পরে স্কুলেও কাজ নেন, ওই বাড়িটাও পেয়ে যান। সি-আই-টি-র প্রথম ব্যাচের বাড়ি।

বাবার সম্পর্কে সোমকে কিছুই জানতে দিতেন না কেন? মা কি ভাবতেন, সোম বাবাকে বেশি শ্রদ্ধা করে ফেলবে, তাঁর মতো হয়ে যাবে?

সর্বদা বলতেন, যখন বিয়ে করবে, তখন মনে রেখো, তোমার প্রথম কাজ স্ত্রীকে সুখী করা।

জয়িকে উনি দেখে যাননি সোমের স্ত্রী হিসেবে। ওর বান্ধবী হিসেবে দেখেছেন। আজ মা থাকলে নিশ্চয় সোমকেই দায়ী করতেন।

—এবার পারব না। পরে কখনো আপনার কাছে বাবার কথা শুনতেই আসব।

—তা এসো। তবে ওরা তো কলকাতার কর্মী, আমরা গ্রামের। যাকে বলে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, তা ছিল না। তবুও, তোমার বাবার মৃত্যুসংবাদে বড় দুঃখ পেয়েছিলাম।

—এসেছিলেন?

দূর! আমি তখন···তবু দুঃখ হয়েছিল। কয়েক বছর পার্টির বড় দুর্দিন যায়। তবুও, আমরা একটা পরিবারের মতই ভাবতাম নিজেদের। আচ্ছা! রংপুরের বিনয় রায় সত্যই মারা গেছে, না?

—হ্যাঁ, মস্কোতে।

—গলা ছিল খুব। চমৎকার গাইত। রংপুরকে রেড রংপুর বলা হত একসময়ে। লাল! সব তেভাগা কালে! কাকদ্বীপে তো লয়াল-গঞ্জের নাম লালগঞ্জ দেয়া হয়।

—তখন ?

—হ্যাঁ। এখন · জানি · লালগঞ্জ নাম নেই···সে সময়টার কারণেও লয়ালগঞ্জকে 'লালগঞ্জ' নামটা এখন দিতে পারত।

লয়ালগঞ্জকে লালগঞ্জ নাম দিয়ে গেলে সে সময়ের শিশু তেলেঙ্গানা কাকদ্বীপ আন্দোলনকে মেনে নিতে হয়। কাকদ্বীপ ও তেলেঙ্গানা সেদিন পার্টির চিন্তাধারা মতোই হয়তো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের কথা ভেবেছিল। পার্টিই পরে "এ নীতি ভুল" বলে আন্দোলন তুলে নেয়। মরতে মরেছিল কৃষকরা, প্রাণ-জমি-জীবন ছারখার হয়ে যায় তাদের। আজ "লালগঞ্জ" নাম দিতে হলে কৃষকের আত্মবলিদানকে মেনে নিতে হয়। তার চেয়ে কলকাতার রাস্তায় মূর্তি বসানো অনেক নিরাপদ।

—হয়তো পারত না।

—তাই হবে, তাই হবে। এই সময়! এখানকার কিছুই আমি বুঝি না। বরঞ্চ গাছেরা ভালো। গাছরা, বুঝলে, দুর্বোধ্য নয়। তারা নীতি বদলিয়ে কর্মীদের ভ্রান্তিতে ফেলে না। অবশ্য, ভুলে যেও না, গাছেরও মান অভিমান আছে।

—আছে ?

—খুব। সুরো বলে এ আপনার পাগলামি। কিন্তু দু-চারদিন বাইরে থেকে যখনই ফিরব, তখন ওদের কাছে যাই তো! খুব অভিমান। গায়ে হাত বোলাব, পাতায় হাত বোলাব, মনে শান্তি আসে, তখন বুঝি যে অভিমান কেটেছে।

সোম হেসে ফেলে।

—এটা বোধহয় আমার কল্পনাই, তবু শান্তি পাই। এই যে চেয়েই যাচ্ছি কয়েক বিঘা জমি, গাছ লাগাব কোনো সাড়াই পাই না। কত লেখালেখি! একটা এমন দরকারী কথা তাই বোঝাতে পারি না! মন খারাপ হয়ে যায়। তখন গাছগুলির মধ্যে ঘুরি, গায়ে হাত রাখি··· শান্তি পাই···

—আর সাপের, থুড়ি, লতার মাথায় পা দিই, সেটাও বলুন ?

সুরো কখন ঢুকেছে ওঁরা দেখেননি। ও বলে, সেদিন ছেলেরা না থাকলে কি সর্বনাশ হত, বলুন দেখি? মারা হল, তা পোড়াতে দিলেন না? ওই লেবু গাছের গোড়ায় গভীর গর্ত করে পুঁতে দিলেন।

—সব সময়ে দেন?

—ওটা যে কত ভালো সার, সুরো!

—বাপ রে! ও গাছের লেবু তো আমি খাব না কখনো। ভয় করে না?

—আমি তো খাই। মরে গেছি?

—আপনাব শরীব মানুষের শরীরই নয়। তা, খাওয়াদাওয়া কখন হবে?

—তুমি চড়িয়ে দাও। দবকাবী কথাটা বলে নিই। খেই হাবালে ভুলে যাব।

—গোপালীব খোল ভুষি আনব কাল।

—কাল তো আশাবাড়ির হাট, নয়?

—হ্যাঁ।

—কাল নিও। তোমাব ব্যাঙ্কার ব্যবস্থা করে বেখেছ! বুঝলে সোম। পোস্টাপিসে খাতা কবে দিয়েছি, তাতে ওর সম্পূর্ণ বিশ্বাস নেই।

সুরো একটু হেসে চলে যায়। বলে যায়, কাল হাট থেকে মাছ আনাব। ওনাকে খেতে হবে।

—আরো! তোমার শুধু ·

—উনি কত কষ্ট করে এসেছেন···আপনাকে কত মান্য দিচ্ছেন · আপনি তো সন্নেসী একটু যত্ন না করলে হয়?

—কোর। বুঝলে সোম, আমি সুরোর ব্যাঙ্কার। ও আমাব ব্যাঙ্কার। ও বড় ভালো ব্যাঙ্কার হে! গাছের ফল পাকুড় ও বেচে। সে টাকা হল আমার আলাদা ফাণ্ড।

—তা আপনি আজ গাছ কিনবেন, কাল গরুর গাড়িতে চারা নিয়ে দধিমঙ্গলে দৌড়বেন, ঘবেরটা পরেব জন্য খরচ করবেন, টাকা লাগে না? আমি যাই।

—খুব খাঁটি মানুষ। দু'ছেলে বউ নাতি নিয়ে চলে গেছে চাকরি পেয়ে। একজন চাকদায় বাড়িও করেছে। এই দুই ছেলে। এদের জন্যেই বেঁচে আছি।

—অথচ আপন কেউ নয়।

—আপন আর পর কি রক্তের সম্পর্কে হয়? সে সম্পর্ক যাদের সঙ্গে, তারা আমার কাছে, আমি তাদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। মরে গেলে এরাই কাঁদবে। মানে···হয়তো! আমি তো তখন দেখতে আসব না।

—বলুন।

—একটু শোনাও।

সোম রেকর্ডার চালায়।

—হ্যাঁ। এ বক্তব্যটা খুব জরুরী। অবশ্য আজকের আমি বলছি। সেদিন আমরা সবাই সমর্থন করেছি। কিন্তু আজ ভাবি, সেদিন সাধারণ মানুষ রাজনীতিতে কৃষ্টির ভূমিকাটা সত্যিই বোঝে, সে কথা বোধহয় আমরা প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাস করি নি। করলে কৃষ্টিবাহিনী গড়ার ভার লোকশিল্পীদের ওপরেই দেয়া যেত। ওদের সঙ্গে কৃষকদের জীবন তো জড়ানোই ছিল।

—সিদ্ধান্ত তো নেয়া হয়।

—করা হল কোথায়! অথচ কি বিপুল সম্পদ আমাদের হাতে ছিল, কি বিপুল সম্পদ! মেদিনীপুরে, নন্দীগ্রাম, পাঁশকুড়া, সবং, পিংলা, ঘাটাল, মহিষাদল, তমলুক থানার হরিচক, নানকারচক, মুরাদপুর, রঘুনাথপুর, লেধ, নয়া, দাসপুর, ঠেকুয়াচক, কাঁকটিয়া, এমন আরো কত গ্রাম জুড়ে পটুয়াদের বাস। অবশ্য অন্যত্রও পটুয়া আছে। এরা খুব ক্ষমতাশালী। পট দেখাত, গান গাইত, পৌরাণিক, সামাজিক, সাম্প্রতিক, কত বিষয়বস্তু!

—এখন নেই?

—মরে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে সব। আজকাল রেডিও আছে, ক্যাসেট আছে, ভি-ড়ি-ও আছে মফঃস্বলেও। কে ওদের গান শুনবে,

ছবি দেখবে? ওরা তো সিনেমা করে না, যে লাখ লাখ টাকা পাবে। লাইন জানে না, যে কোথায় গেলে হরির লুটে ওরাও ভাগ বসাতে পারে। অথচ কি সম্পদ?

—মরে যাচ্ছে?

—জমি নেই, পট দেখার, গান শোনার লোক নেই। পট, ছবি হিসেবে কেনে ধান্দাবাজ, দেশে-বিদেশে বেচে চড়া দামে। অথচ সে সময়ে তমলুকের পটুয়া আসলাম চিত্রকর আমাদের মন্বন্তরের, আগস্ট আন্দোলনের পট দেখিয়েছে, গান শুনিয়েছে কত! মাতঙ্গিনী হাজরার পটও দেখেছি। খুব পপুলার পট। পুলিশ কিছু পট বাজেয়াপ্ত করেছিল।

—আপনি তো কৃষক ফ্রন্টে ছিলেন।

—ছিলাম তো! ব্যাপার কি জানো? এই যে গান। এই যে পট, এ সব যাবা করে, তাদেরকে সঙ্গে রেখে এগোবার দরকার যে কত বড়ো, সে তো তখন বুঝি নি। ওই আসলাম প্রথমে, তারপব আরেকজন, আমাকে ওদের জীবনে জড়িয়ে ফেলল।

—আর কে?

—আসলামের কথাটাই বলি। পটুয়াদের তুলির টানটোন খুব, তোমাদের ভাষায় বলিষ্ঠ। তখন তো রং ওরা বানাত, পট আঁকত, গান বাঁধত, গান গেয়ে পট দেখাত। তা সাবুয়া গ্রামে আছি তখন, কৃষক সংগঠন করছি। লেঠেল রাম বলল, শ্রাবণের বর্ষা। বেঙার বউ মুড়ি ভেজেছে। চলো সেখানেই যাওয়া যাক।

—বেঙা চাষী?

—হ্যাঁ, মাঝারি চাষী। স্বামী-স্ত্রীকে আমরা বলতাম বেঙা বেঙি। মন্বন্তরে খুব মার খেয়েছিল। তাতেও জমি বেচেনি। ওর বাড়িতে থাকতাম। তখন পার্টির নিয়মকানুন খুব কঠোর। কৃষকের মধ্যে কাজ করবে, তো তার মধ্যেই থাকবে। সে যা দেবে তাই খাবে। যেয়ে আমি তো বলছি, কি গো বেঙা, আজ আহার, না অনাহার?

তা বেঙা ছিল খুব রসিক। বেঙা দলুই। সে বলছে, আহার বলতে মুড়ি পেঁয়াজ, আর যা আছে তাতে পুষিয়ে যাবে।

সেটা কেমন হল? আমি শুধোচ্ছি। তা বেঙি বলছে, তোমরা তো কিষ্টোবাহিনী করবে। সেদিনে বলেছিলে। তা আজ দেখ, কাকে পেয়েছি, ওই যে আসলাম চিত্রকর! জল নেমেছে, ঘরে যেতে পারবে না। তোমাদের নাম শুনে কিষ্টোবাহিনী কোথায় শুধোতে শুধোতে এখানে এসেছে। ওর পট দেখ, গান শোনো, আমরা তো শুনি হরদম।

রোগা রোগা মানুষ, মুখে অল্প হাসি। আমরা বসলাম, লণ্ঠন জ্বলছে। লণ্ঠনটা আমরাই কিনি। রাতে মিটিং করতে সুবিধা হত। সেই লণ্ঠনের আলোয় ও পট দেখাল, গান গাইল।

পটে ছবির পর ছবি। চাষী গালে হাত দিয়ে বসে আছে। রাবণ ভূঞা চাল কিনছে। রাবণের চালের গুদাম, সামনে বুভুক্ষু জনতা।

কিনবার কালে বারণ বলে
আট টাকা মণ!
বেচবার কালে রাবণ বলে
ত্রিশ টাকা মণ!
টাকা কোথায় পায় যে রে কৃষক,
টাকা কোথা পায়!
ঘর ছেড়ে কৃষক দেখ
কাঁথি চলে যায়!

সেই দলে দলে গৃহত্যাগ, পথে পড়ে মরা, আর কি রকম উপসংহার!

যুদ্ধ যুদ্ধ বলে সকল
চাল সরায়ে নেয়
আকালে আগুন জ্বলে,
নিভিবার নয়!
ও ভাই, চাষী ভাই,
কারে বা শুনাই!

দেশ যে শ্মশান হল,

মানুষ তো নাই!

লঙ্গরখানা যাব বলে

পথে বাহিরিল

চলিতে চলিতে পথে

পড়ে যে মরিল!

সরকারের লঙরখানা

চাল বিহনে বন্ধ!

আসলাম চিত্রকর বলে,

কাঁথির কপাল মন্দ!

সেই কঙ্কাল মিছিল, সেই শকুনের ভিড়, সেই শবেব পাহাড়। সব যে গানের গুণে আর পটেব গুণে আমাদেব কাঁপিয়ে দিল।

—আশ্চর্য!

—আশ্চর্য নয়? আসলামকে নিয়ে আমবা পড়লাম। আমাদের যা যা কর্মসূচী, তা নিয়ে গান বাঁধতে পার? পট আঁকতে পার? সে বলল, সব পারি।

—আশ্চর্য!

—সোম! এই রকম একটা লোক! ও বলল, কত পটুয়া চান? আমরা সবাই আসব। তা, আমি তো ভাবলাম, এদেরকে সঙ্গে পেলে আমাদের কাজ কত সহজ হয়। আমাদের বক্তব্যগুলিই এদেরকে বুঝাব। এরা তা নিয়ে পট লেখবে। গান বাঁধবে। ওখানকার অবস্থা তখন খুবই খারাপ। সুযোগ পেলে পি. সি. সমাচাব পত্র পড়ে নিও। আমাদের পক্ষেও কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন করা খুব সহজ ছিল না। ওই সমাচার পত্রে সব পাবে। স—ব পাবে। আজ ভাবতে বসলে অবাস্তব লাগে, কোনটা সত্যি। কৃষকের ঘরে কিছু নাই, সে তার মৃতা মায়ের তোলা ধুতি বের করে দুই ভাগে ছিঁড়ে দিল আমাদের দুজনকে। বলে, কমরেড! তাঁতের কাপড় একখান পাঁচ টাকা, কন্ট্রোলের কাপড় আট টাকা, ধানের মণ

বারো টাকা। বোঝেন, সরকার আমাদের কি মার মারছে। এটাই পরেন স্নান করে।

—আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন।

—ছি ছি। এটা কি বললে? কষ্ট করেছে ওরা, আর আমরা সবাই ওদের ভাসিয়ে দূরে চলে এসেছি। আমার তো সম্পর্কই নাই। তবু যা দেখি, এখন সব ধাক্কা। বড় বড় ধাক্কা!

—কি রকম?

—বনগাঁয় এখন সেটেল করেছে, পুরাতন এক কমরেড, ছেলেরা পার্টিতেই আছে। তার এক ছেলের বউভাতে ধরে নিয়ে গেল। যেয়ে আমি তো শুধু দেখছি।। বুড়োরাও আছে, ছেলেরাও আছে। বিয়েতে পুরুত নাই, রেজেস্টারি। কিন্তু যৌতুক দ্রব্য যা, দেখলাম, লক্ষ টাকার উপর, ধাক্কা খাইলাম। তোমার মা বাবার বিয়ের কথা মনে পড়ল। বর আছে, কন্যা আছে, রেজেস্টারি করো, মাছ ভাত খাও। এখানে দেখি সকল দলের নেতা কর্মীই হাজির। নেতাদের ধুতির পাড়ে এই চওড়া ধাক্কা। সবাই নামে মোটর থেকে। মোটরের ধাক্কা। তা দুই রাজনীতিক কর্মীর বিয়ে আর মোহন তফাদারের ছেলের বিয়ে, পার্থক্য তো দেখলাম না কিছু। এখন সবেতেই ধাক্কা খাই। আমরা রাজনীতিতে নেই, ভালো আছি।

—আপনাকে ডাকে না?

—আগে ডাকত। এখন মনে করে মানুষটা গাধা! হয়তো তাই। রাজনীতির ব্যাখ্যা আমরা তখন···

—আসলাম পটুয়ার কথা বলছিলেন।

—হ্যাঁ, আমরা সেদিন কৃষকসভার কর্মী। তাদের নিয়ে সংগঠনের কথাই ভাবছি। বললাম, তোমাদের গ্রামে যাব। সে হাসছে আর বলছে, গ্রাম তো অনেক। কতগুলি গ্রামে যাবেন? আমি আর লেঠেল রাম বলছি, যতগুলি গ্রামে পারি। আমাদের ভাবনা, প্রচারের কাজ, জাগরণের কাজ, এরাই করবে।

—গিয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে?

ভোলানাথ বললেন, গিয়েছিলাম। "কমরেড" বলেছে, সে শব্দের ইজ্জত রাখতে হবে না ?

সোম বোঝে, ভোলানাথ পিছন পানে হেঁটে যাচ্ছেন। তার সামনে বসে আছেন, কিন্তু বনগাঁ মহকুমার ভিতরগাছিতে তিনি নেই। পূর্বাচলের দিকে তাকাচ্ছেন।

—সময়টা কি ভীষণ ছিল কেমন করে বোঝাই। সেটা ১৯৪৪ সাল। দেখ, মন্বন্তরের কথাও ভাবি। মন্বন্তরের তিন বছরে আমরা গ্রামাঞ্চলে রিলিফের কাজে জোর দেই। মন্বন্তরের আগেই তো সরকার নীতি ঘোষণা করল যে কাপালীরা এসে বাংলায় যাতে খাদ্য না পায় সেটা দেখতে হবে। সরকারই খাদ্যশস্য তুলতে থাকে। মজুতদারেও গোলা ভরে।

—সরকাবী হিসেবে পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক মরে।

—বেসরকাবী হিসাবে তার বেশি। অথচ এই মন্বন্তর এ জন্য হয়নি যে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি ছিল, দেশে খাদ্য ছিল না। খাদ্য ছিল, সরকার এবং সরকারের মদতপুষ্ট ব্যবসায়ী-মজুতদার বাজার থেকে চাল তুলে নিয়েছিল। পঞ্চাশের মহামন্বন্তর।

এখনো তো তাই, এখনো তো তাই। ভারতবর্ষ খাদ্যশস্য বাড়তি উৎপাদন কবে, বাইরে পাঠায়। ভারতের কত অংশে লেগে থাকে এঁটুলির মতো দুর্ভিক্ষ-অবস্থা। এতদিনেও তো দেয়া গেল না তৃষ্ণার জল, দিনান্তে এক মুঠো খাবারের আশ্বাস।

—তারপব ?

—আমবা বললাম মজুতদারী ঘৃণ্য কাজ। কিন্তু মজুতদারের গোলা ভেঙে ধান চাল লুট করে বিলাই নি। ওই ত্রাণকার্য, রেশন ব্যবস্থা জোরদাব করো।

—এ সব কথা মনে পড়ে খুব ?

—মনে পড়ে। তোমাকে যে বলছি, তার কারণ অন্তরে বড়ো আকুতি। তরুণরা জানুক, বুঝুক। মন্বন্তরের পিছনের ষড়যন্ত্র বুঝুক ; জানুক তখন যুদ্ধ চলছিল ; ফাসিবিরোধী ফ্রন্ট হল ; যুদ্ধকে বললাম

"জনযুদ্ধ" ; ফাসিস্তদের পরাজিত কবাটাই ছিল প্রধান কথা। মন্বন্তর বিষয়ে বিপদ না জানলে হয় না সোম। মন্বন্তরে কৃষক মরল পথে পড়ে, আব কত তাড়াতাড়ি তেভাগা আন্দোলনে দেখাল তার অন্য চেহারা।

সোম বুঝতে পারে সে নিজে, তার মতো মানুষবা কি চমৎকার কৌশলে বর্তমান ব্যবস্থার শিকার হয়ে গেছে। ধারালো বুদ্ধি, অনেক লেখাপড়া, অথচ দেশ বা মানুষকে জানে না, জানতে দেওয়া হয় না। বিসার্চ ধর্মী লেখা ? সেও তো অণুবীক্ষণিক। দুর্ভিক্ষাঞ্চলে মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে লেখো, তারপর যাও মেয়েবা মেয়ে সন্তান চায় না কেন তা জানতে, তারপর অন্য কিছু ··

সবই বুড়ি ছুঁয়ে আসা।

গভীরে প্রবেশ করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা নয়। করতে গেলেও বিপদ। প্রকাশ ও সীমা রাজভোরেকে নূতন প্রধানরা পাঠায় দীঘড়ি এলাকায় কীটনাশক ব্যবহাব বিষয়ে কৃষকদের মতামত জানতে। এ সব প্রকল্পের পিছনে বড় বড় টাকা খাটে। দীঘড়ি থেকে পাঁচ মাইল দূরে পুলিশ, হরিজন মেয়েদের গণধর্ষণ করেছিল। সীমা সে ব্যাপারে খবরাখবর নিয়ে সত্য ঘটনাটি ছেপে দেয়। জনৈক ধনীব দরকাব হরিজনদের জমি, অতএব বাজে চুরি কেস সাজিয়ে পুলিশকে উনিই ঢোকান ওখানে। এই ধনী ব্যক্তির দিল্লীতে খুঁটি আছে।

নূতন প্রধান, প্রকাশ ও সীমাকে ছাড়িয়ে দেয়। হ্যাঁ, কীটনাশক বিষয়ে কাজটা করেছ ঠিকই। কিন্তু অমুক কাগজে ছাপাবে বলে ওই লেখা লিখতে গেলে কেন ? দিল্লীতে এখন পরমজিৎ সহায় আমাদের চেপে ধবেছে। তা ছাড়া পুলিশ রিপোর্ট বলছে, হরিজন মেয়েগুলো বেশ্যাবৃত্তি করত। তাই বন্ধ করতেই ওরা···ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সীমা তারপর ঝাপাটিয়া হরিজন মহিলা মুক্ত মঞ্চে নেমে যায়। জল ঘোলা হয়। কেসটি চাপা পড়েছে। বিহার সরকার দারোগাকে বদলি করেছে।

এ সব সমীক্ষা করানেওয়ালা সংগঠনগুলি কায়েমী ব্যবস্থার সন্তান, এবং পিতৃভক্ত সন্তান।

সে জন্যই জানা হয় না বারোআনা, জানানো যায় না। কিন্তু সোম এটাও জানে, যে সততা থাকলে লেখক জানতে এবং জানাতে পারে।

—কি বলছিলেন?

—হ্যাঁ, বলছি। সেটা ১৯৪৪ সাল। বছরের গোড়ায় আমরা দিনাজপুরে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন করে এসেছি। মানুষের তৈরি মন্বন্তরের ঘা তখন দগদগে। না খেয়ে পথে পড়ে মরল যারা, তাদের হিসাব আছে। তারপর অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মরল, মরল মহামারীতে। কত শিশু বিক্রি হয়ে গেল, কত মেয়ে টাউটের পাল্লায় পড়ে বেশ্যা হয়ে গেল, সেও তো মৃত্যুই।

—আপনারা কাজ তো থামান নি?

—না। মাধব দত্ত জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়িতে কৃষক সংগঠনে এক প্রথম সারির নেতা। বেঁচে তো নেই বলে শুনলাম। সে নাকি আত্মজীবনী লিখছিল। কোনোদিন তা ছাপা হলে অনেক কথা পরিষ্কার হবে।

—নাম জানি না।

—ক্ষমতাসীন সরকারের বড় দলেই ছিল। মুর্শিদাবাদে এক কলোনীতে···খুব দরিদ্র দশা···মুখে হাসি উজ্জ্বল···মাধব দত্তের খবর কে রেখেছে বলো? লেঠেল রাম মরে গেলেই কি কেউ কাগজে লিখবে? রাজনীতিক দলগুলির কাছে এরা মূল্যহীন। অথচ এদের আত্মদানে পার্টিগুলি গড়ে উঠেছিল···সবচেয়ে দুঃখজনক কি জানো?

—কি?

—রাজনীতির নামে ভ্রষ্টাচার, বিলাসিতা, জনগণ থেকে দূরে সরে যাওয়া, এর ফলে রাজনীতিক দলগুলি সম্পর্কে মানুষ বিশ্বাস হারিয়েছে। হারাবে না কেন? গরিবের ঘরে তো গরিবের কমরেডরা

আসে না। তারা মটর চেপে মিটিং করে যায় আর গ্রামে গ্রামে প্রতিটি দলের মধ্যে একটা ধনী কুলাকশ্রেণী গজিয়ে উঠেছে।

—আপনাদের কথা বলুন।

—কাল যে ছিল কংগ্রেসের জোতবাবু, যার জমিতে বর্গা রেকর্ড হল, আজ সে পার্টিম্যান। গরিব ভাগচাষী ও জমিমালিক সবাই কমবেড। তা, ভাগচাষী আজ সে জমিতে পা রাখতেও পারে না, জোতদারের পোয়াবারো, এমনও ঘটেছে। না, ভাবব না, আমার গাছপালাই ভালো।

—হ্যাঁ, গাছ তো দরকার।

—মানুষ দবকার, মানুষ।···যাক্ গে! সে সময়কার কাজ, জেলায় জেলায় মেডিক্যাল রিলিফ, খাদ্য রিলিফ ··গ্রামের জীবনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা মজুতদারীর বিরুদ্ধে প্রচার রাখা···কৃষকসভার প্রসার কবা···আর, চালের দর তো খুব বেড়েছিল, তাতে খাদ্য অভিযান চালাবাব কথাও হয়। একটা কথা বলি। জলপাইগুড়ি এলাকার মতিবাবু বর্মণ, রাজবংশী কৃষক, নামই মতিবাবু, সে একদিন কেঁদে ফেলল। বলল, মায়ের উপর রাগ দেখাতে ভাতের উপর রাগ দেখাতাম। অন্ন তো লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে হেলা করতাম, লক্ষ্মী ছেড়ে গেল।

—সে সময়টা···

—সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

—কেন?

—তেভাগা আসছে বলে। জীবনে কোনো কিছুই বিস্মিত নয় হে। একটা সময়ের ধারাবাহিকতা আরেকটা সময়কে তৈরি করে। মন্বন্তরের সঙ্গে তেভাগা যুক্ত।

—মন্বন্তরে তো গ্রামবাংলা ধ্বংস হয়ে যায়।

—হলেও বা, মানুষ কি ধ্বংস হয়? বাংলার কৃষিজীবী মানুষ কি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল মনে মনে? তাঁরা বাঁচবার পথ খুঁজছিল। তেভাগার চিত্রও একেকখানে একেকরকম। দিনাজপুর,

জলপাইগুড়িতে মাধব দত্ত ও অন্যান্যরা, বিশেষ কৃষক-ভাগচাষীরা বাজে আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন আগে শুরু করে ও বাজে আদায় অনেক দূর অবধি বন্ধ হয়ে যায় তেভাগার আগেই। আবার কাকদ্বীপে তেভাগার প্রথম পর্বে, বাজে আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয়। তে-ভা-গা! আমরা বহুৎ গর্ব করি, কেমন? কিন্তু সত্য কথা, ফ্লাউড কমিশন ১৯৪০ সালে তেভাগার দাবী স্বীকার করে নেন তাঁদের রিপোর্টে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা তেভাগার বিষয়ে নীরব ছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার মতে, ফ্লাউড কমিশন জমিদারদের নিয়ে গঠিত। তাব চেয়ারম্যান সেদিনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ফ্লাউড। অথচ ঐতিহাসিক সত্য হল, ভাগ চাষীর যে উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দু'ভাগ পাওয়া উচিত, সে নীতিকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় ফ্লাউড কমিশন। তেভাগা প্রশ্নে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা সেদিন নীবব। কে খবর রাখে কিছু গবেষক ছাড়া?

—সত্যি, কিছুই জানি না।

—দেখ, কমিশন রায় দিলেও তখনি তেভাগা হয় নি। কৃষিজীবী মানুষ পথ খুঁজছিল। তাবা মনে মনে প্রস্তুত, একটা পরিবর্তন চাইছিল, আমরাও ওদের সঙ্গে ছিলাম। মন্বন্তরে ওরা মার খেয়ে যায়। যে-যার বলদ, বীজ, এ সব যোগাড় করতে পারছিল না। গাঁতা প্রথা চালু করে সে সমস্যার খানিক সমাধান হয় কয়েক জায়গায়।

—গাঁতা প্রথা?

—কয়েকটা পরিবার জোট বাঁধল, যে-যার লাঙল-বলদ জড়ো করল, একসঙ্গে চাষ করল।

—যৌথ প্রথায় চাষ?

—আমরা তো সেদিন রাজনীতিতে অন্ধ। আমরা ভাবলাম এটা হল যৌথখামারের অঙ্কুর। ক্রমে এটা সর্বত্র ছড়াবে। কি নিদারুণ অজ্ঞতা। হালবলদ থাকে ধনী চাষীর। বড় চাষী, মাঝারি চাষী,

এ-অবধি তবু ভাবছি। পরে ভাগচাষীর কথা বড় হয়ে উঠল। কিন্তু ক্ষেতমজুর বা খুব ছোট চাষীর কথা ভাবলাম না। আজ মনে করি, তেভাগা প্রশ্নে নীরব কেন ছিলাম। নিশ্চয় শ্রেণীস্বার্থে। অবিভক্ত পার্টি বলো, লীগ বলো, জমিজমা তখন থাকত মানুষের। ভাগচাষীরা চাষ করত। তাদেরকে দুই ভাগ দেব, নিজেরা এক ভাগ নেব? মনের মধ্যেই বাধা। বাংলার ধনী জমিদারদের দু'এক ঘরও সেদিন পার্টিতে।

—তাঁরা খুব চোট খান নি।

—তারা দারোগা, চোট খায় না। জনগণ রাজহাঁস। ডিম পেড়ে চলে। যাকগে, গীতা দেখে স্বপ্ন দেখা, ওটাও অজ্ঞতা ছিল। সব গণ্ডগোলের মূলে যে প্রাচীন ভূমিব্যবস্থা, যেটা ধ্বংস করা দরকার ছিল, সেটাকেই আমরা আজও বহাল রেখেছি।

—পটুয়া গ্রামে গেলেন তখন?

—হ্যাঁ গেলাম। বুকে অনেক কথা জমে আছে। এ কথা থেকে সে কথা মনে এসে যায়। ভ্যানটার বুদ্ধি ছিল। তবে ও তো কোনো কথা শুনতে শেখে নি। সাত বছর বয়স থেকেই সবজান্তা। অঙ্কে একশোয় একশো পেত···যাক গে, আমরা যে ওর গান শুনে উৎসাহ পেলাম। তাতে আসলাম যেন নতুন জীবন পেল। এটা তো আজও আছে। বাইরের মানুষ এসে তার কথা শুনলে গ্রামের মানুষ ধন্য হয়ে যায় মনে মনে। আমরাই তো ওদের মনে এই ধারণা তৈরি করেছি যে আমরা সব জানি, তোমরা কম বোঝো। সবই ভুল করেছি।

—ওঁর গ্রাম কি দূরে?

—তমলুকে। বিয়াল্লিশের আন্দোলন, সমুদ্রে সাইক্লোন, মন্বন্তর। আবার স্বাধীন তমলুক ঘোষণা,—ওঃ, তমলুক, আর মেদিনীপুর, সরকারী প্রহার আর প্রকৃতির প্রহারে তখন বিপর্যস্ত। নির্মম অত্যাচারও হয়েছিল। আমরা দু'জন তাই ভাবছি। নিয়ে তো যাচ্ছে, খেতে দেবে কি? দুটো মানুষের খোরাক যোগাবে, সে তো ওদের ওপর অত্যাচার হবে।

এতে আমাদের কিছু করার ছিল না। তখনকার নীতি, ওরা যা দেবে তাই খাবে, না দিলে না খাবে। কিন্তু নিজে কোনো ব্যবস্থা করবে না।

প্রথমে নিয়ে গেল ওর গ্রাম দেউলেশ্বরে। দেউলেশ্বরের মন্দির ছিল, মন্দিরের চারধারে গাছ, অনেক বানর। গ্রামে প্রায় চল্লিশ ঘর পটুয়া থাকত তখনো। পরে শুনলাম এখন আর কেউ পট দেখে না, গান শোনে না। বলে, ছবি দেখলে সিনেমা আছে, গান শুনতে রেডিও আছে.। এটা বর্তমান চিত্র।

—ওরা কি করে ?

—পুতুল গড়ে, প্রতিমা গড়ে, মজুরি খাটে। পটুয়া সম্প্রদায় তো বলে ওরা ধর্মে ইসলাম. কিন্তু মোল্লা মসজিদে যায় না। একটা উদার ধর্মনীতি, আর নামের মধ্যে অন্য রকম নামও পাবে, পদবী সবারই "চিত্রকর"। আসলামের মা, ওদের মেয়েরা, অপূর্ব পুতুল গড়ত।

আসলাম সকলকে ডেকে আনল। কান্তি চিত্রকব খুব বুড়ো, ওদের গুরু মতন। কান্তি চিত্রকরই কিন্তু প্রথম এঁকেছিল মাতঙ্গিনী হাজবার পট। ও রাসুমণির পটও এঁকেছিল। রাসুমণি গয়লানী। তার দুই ছেলে আগস্ট আন্দোলনে মারা পড়ে। এগারো বছরের ছোট ছেলেটাকে নিয়ে ও পতাকা হাতে থানায় ছুটেছিল। খুব শূরবীর মেয়েছেলে।

আসলাম বলল, সকলকে বুঝিয়ে বলেন, কি চান আপনারা। জমিদারের অত্যাচার, পুলিশের অত্যাচার, উমাপতি মহান্ত ধান দিল না বলে কত লোক মরল। ভাগে চাষ করে ভাগ পায় না, সব আমরা এঁকে দেব।

তবে লেঠেল রাম বলছে, বাপ সকল! তোমরা তো চাষীবাসী মানুষ নও। আসলাম বলছে, ওরা ধর্মমতে ভাগ পেলে ঘরে ভাত থাকবে। আমরা পট গাইলে ধান পাব, পয়সা পাব। আপনারা যে এসেছেন, সে তো সবাই খেতে পরতে পাবে বলে। মানুষ যদি খেতে পরতে পায়, তাহলে কুমোর-কামার-তাঁতি-ছুতার সবাই বাঁচবে।

—দেখ! কত বড় কথাটা বলল। চাষীর সঙ্গে তো ও সব মানুষও আছে।

—ওরা কাজ করেছিল?

—আমরা দু'জন দিন সতেরো থাকলাম। অবিরত মিটিং করি। আজ এ গ্রামে, তো কাল সে গ্রামে। বোঝাতে বোঝাতে তবে কাজ হল। এ কথা কোথাও লেখা নেই, সেদিন ওই চিত্রকররা নেতৃত্ব দিল একটা দেশজ সংস্কৃতি আন্দোলনে। সাতটা থানা থেকে আমরা অন্তত শতখানেক চিত্রকরকে পেয়ে গেলাম। গ্রামে, মহকুমায় আমরা সভা করেছি তো ওরা পট দেখিয়ে গান গেয়েছে।

—প্রকাশ্যে করতে পারতেন?

—না না, সন্ধ্যার পর, গোপনতা রক্ষা করে। পুলিশের ভয়, গ্রামে পুলিশকে খবরদাতাও থাকে, আর তমলুক তখন খুব সেনজিটিভ জায়গা। "তমলুক" নাম শুনলে জেলার পুলিশ খানিক ভয় পেত।

—তারপর কি হল?

—আমরা ধরে নিলাম যে ওদের কাজটা কৃষকসভার কাজেরই অঙ্গ বিশেষ। ওদের দিয়ে গ্রামে শিল্পীবাহিনী গড়ে তোলার যথার্থ কাজ হবে। সে কাজ শুরুও হয়ে গেছে, এ কথা কলকাতা যেয়ে বলে আসি। শশাঙ্কবাবু, শশাঙ্ক রায়, সিনিয়ার ম্যান,—কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল। আমরা অনেকেই ছিলাম,—অধিক কথা কি। কম্যুনিস্ট পার্টি আর কংগ্রেস তো একসঙ্গেই কাজ করেছে দীর্ঘকাল,—শশাঙ্কবাবু বলল, এইটে খুব ঠিক কাজ হয়েছে। অন্যরাও ভালো বলল। তমলুকে দুর্ভিক্ষের পটটা দেখিয়েছিলাম, তা উমাপতি সেন সেটা নিয়েই নিল। তার মৃত্যু হল অচিকিৎসায় পঞ্চাশ সালে। আর শশাঙ্ক রায় যে রানাঘাটে থাকত, সেদিন মারা গেল, কাগজে দেখলাম। খুব খাঁটি লোক ছিল। শেষের দিকে অভয়া কলোনিতে হোমিও ওষুধ দিত। তা, কলকাতা থেকে অনেক উৎসাহ নিয়ে ফিরলাম। আমিও এলাম, আর আসলামও এসে হাজির।

—খুব খুশি হল?

—সেইটাই তো বলার কথা।

ভোলানাথ নিশ্বাস ফেললেন।

—সবসময়ে এই হয়েছে। মানুষের দোরে গেছি, মানুষ তো আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে। সে উদ্দীপনাকে কাজে লাগাতে পারি নি। পিছিয়ে এসেছি আমরাই। পিছিয়ে আসার ব্যাপারটাকে যুক্তি দিয়ে সাজিয়েছি। কিন্তু এ বয়সে স্বীকার করাই উচিত যে আমি মনে করি আমরা পীপ্‌লের সঙ্গে চলতে পারি নি। পথে নামিয়েছি, তারপর বলেছি, সরে এসো। দাম তারা দিয়েছে, আমরা, ভদ্রলোকরা দাম দিই নি।

—কেন এ কথা বলছেন?

—আরো কি। এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করতে যেয়ে দেখেছি, অবিভক্ত পার্টির সময়ে কোন আন্দোলনে কি ভুল হয়েছিল। সে আত্মসমালোচনা করতে বিভক্ত পার্টির কোনো পক্ষই নারাজ। আমার কাছে সেও এক দুর্বোধ্য রহস্য। আমরা ছিলাম কর্মী, নেতা ছিলাম না। পীপ্‌লের সঙ্গে থাকতাম আমরা, নেতারা নয়। আমরাও কোনো কথা জানতে পারব না? অথচ সেদিন যারা নেতা ছিল, তারা আজও নেতা। এক সময়ে দরকারে কৃষক, মজুরের কাছে যেত, আজ তাদের জীবনযাত্রা দেখ! সেই যাওয়াযাওয়ি ভাঙিয়ে খাচ্ছে। মানুষের সঙ্গে সংযোগই নেই। জনগণ থেকে দূরে থাকছে শহরের নেতা, গ্রামের নেতাও। এর দাম কে দেবে?

—আসলাম কি বলল?

—সে তো খুব দিশাহারা। বলে, কমরেড! এ তো মহাবিপদ হয়ে গেল। নতুন পট মানুষ খুব দেখছে, পয়সা উঠছে। সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পট, মনসামঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র, এ সব পটও দেখাই। কিন্তু বাবুরা খুব ক্ষেপে গেছে। বলছে, আমাদের জমিতে বাস করো, আমাদের নাক কাটছ? ও সব নতুন পট দেখানো চলবে না। যারা তোমাদের নাচাচ্ছে, তারা তোমাদের শত্রু। তোমাদের বিপদে ফেলে একদিন সরে যাবে। ও সব পট ছিঁড়ে ফেল। নয়তো গ্রাম থেকে

তুলে দেব।' এখন বলুন আমরা কি করব। খুব গোলমালে পড়েছি।

তা 'বাবু" বলতে জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী। দেউলেশ্বর গ্রামে হরগোবিন্দ পাঁজা ওদের "বাবু"। জমিভূমি আছে, জলকর আছে, বাগান আছে। কথাবার্তা খুব শান্তভাবে বলে। সর্বদা একটু একটু হাসে। নিজেকে গান্ধীবাদী বলে। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তাও চলত। তার কাছে গেলাম। বললাম, এরা তো মন্দ কাজ করছে না। এদের উপর বিরূপ হলেন কেন? ভয়ের তো কিছু নেই। সরকারী নীতির ফলে মন্বন্তর হয়েছে। আগস্ট আন্দোলন হয়েছে। স্বাধীন তমলুকও হয়েছিল। সমুদ্রে ঝড় ও বন্যাও ঘটেছিল। মাতঙ্গিনী হাজরা, রাসুমণি, এরাও সত্য। এ সব বিষয়ে পট দেখালে ভুল কি আছে?

সে বলল, মজুতদারের কথাও বলছে। বাবুরা চাল মজুত করে মানুষকে মেরেছে, সে কথাও বলছে।

আমি বললাম, সে কথা তো সত্যি।

ও বলল, দেখুন ভোলাবাবু! বিয়াল্লিশের আন্দোলন হয়েছে, সাইক্লোনে সর্বনাশ হয়েছে, মন্বন্তর হয়েছে, পুলিশের অত্যাচারে কাঁথি-তমলুক জ্বলে গেছে। এ সব হয়ে গেছে, মানুষকে পট দেখিয়ে মনে জাগাতে হবে না। মানুষের মনে আছে। আপনারা তো "জনযুদ্ধ" বলেন। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে তো আপনারা ছিলেন না, এখন পটুয়াকে বলছেন পট আঁকো। যাক গে, ওদেরকে দিয়ে ও সব পট যে প্রচার করছেন, মানুষ তো এখনো দুঃখেকষ্টে আছে। তারা যদি ক্ষেপে উঠে, "কোথায় চাল" বলে চড়াও হয়? তার পরিণাম তো ভালো হবে না।

আমি বললাম ভয় পাচ্ছেন?

লোকটা মুখে হাসি ধরেই রাখল। পান খেত খুব। শখও ছিল। বিরকুলি পান ছাড়া খেত না। বলল, পান খান। ঘরে সাজা, ঘরে ভাজা দোক্তা! ভয়ের কথা বলছেন? আরে, ভয় আমাদের নয়।

ভয় আপনাদের চেলাদের। কথা না শুনলে পটুয়াদের উচ্ছেদ করে দেব। মরবে সব সবংশে।

বললাম, উচ্ছেদ করবেন গরিবদের ?

গরিব, গরিবের মতো থাকুক না। সে যে গরিব, সে কথা ভুললে ছেড়ে দেবে কেউ ? বেয়াল্লিশের আন্দোলন, স্বাধীন তমলুক, এ সবের মধ্যেও জমিভূমিবান লোক কম ছিল ? পট দেখে আর গান শুনে এরা যদি হামার-খামার লুঠ করতে চায়, যার হামার-খামার, সে ছেড়ে দেবে ? রাজনীতি হল অন্য জিনিস। কিন্তু লোকসান সহ্য করবে না কেউ। ওই যে আপনাদের দরদী মথুরাবাবু, সে গোলা খুলে দেবে ? দেবে না, কেউ দেবে না। মরতে মরবে পোক পতং। যে কাজ করছেন, তার পরিণামটা ভেবেছেন ? ওদের উচ্ছেদ করলে বসত করাতে পারবেন কোথাও ?

—এটা তো ভাববার কথা। আপনাদের চিন্তাধারা তখন কি রকম বলছিল ?

—আমরা কর্মী। সংগঠনে নেমেছি, সাড়া পাচ্ছি, একটা দিকই দেখছি। আর…

ভোলানাথ শুকনো গলায় বললেন, আমরা তো ভেবেছিলাম বিপ্লব এসে গেছে। দেশটা রাশিয়ার মতো হয়ে যাবে। বিপ্লব ল্যাম্প পোস্টের আড়ালে। তাকে ডেকে এনে বসালেই হয়। ভেবেছিলাম আমরা, ভেবেছিল অন্যরা। সে সময়ে কত কমরেড ছেলেমেয়ের নাম রাখছেন লেনিন, স্ট্যালিন, টিমু লেংকো, জোয়া, তানিয়া, কত কি ! পরে সে সব নাম পালটে পুরনো নাম বহাল রেখেছেন।

—আমার এক বন্ধুর দাদার নাম লেনিন পাল।

—তার বাবাও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল।

—যাক গে, দেউলেশ্বরের কথা।

—হরগোবিন্দের কথা আমাদের নতুন চিন্তার মধ্যে ফেলে দিল। কর্মসূচীতে তো সবই আছে। মজুতদারী ও চোরাচালানীর বিরুদ্ধে অভিযান করো, মজুত ধান-চাল উদ্ধার করো, খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থার

উন্নতি চাই। খুচরা পয়সা কোথায় গেল? কেরাসিন মিলে না কেন? প্রতি গ্রাম থেকে অন্তত দশজনকে নিয়ে কৃষকবাহিনী গড়া হচ্ছে। দিনাজপুর ও জলপাইগুড়িতে কৃষক—ভাগচাষী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ার সাফল্য জেনে এসেছি। এখানে এ কাজে চিত্রকরদের ভূমিকা কম নয়। সে ভাগচাষী নয়, চাষও করে না, কিন্তু মেহনতী মানুষের স্বার্থে সে এগিয়ে এসেছে, আমরা সেটাই দেখছিলাম। এখন ভাবতে হল, নিরন্ন মানুষ, যে নানামুখী শোষণের শিকার, যে বিয়াল্লিশে মানুষকে সরকার-বিরোধী আন্দোলন করতে দেখেছে, সে নিজেও প্রতিবাদ করতে পারে।

—আগে সে কথা ভাবেন নি?

—আগে…এ ভাবে ভাবিনি। হরগোবিন্দ অতটা মারমুখো হবে সেটাও ভাবিয়ে তুলল। সে যে শ্রেণীর লোক, তার শ্রেণীস্বার্থে ঘা লাগলে সে মারমুখো হবেই। আসলামরা একটা ছোট সম্প্রদায়। দুর্বলকে মেরে অসৎদের শেখানো একটা পুরনো কৌশল। কথা হল, আসলামদের পক্ষে কে এগোবে মার আসলে। জনগণ মারমুখী হলে অবশ্যম্ভাবী ভাবে পুলিশ ঠেঙাবে, জমিদার উচ্ছেদ করবে। তখন অন্য পথ খোলা থাকে না, সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যেতে হয়। কিন্তু সে ভাবে আমরা ভাবি নি, প্রস্তুতি নেই, সংগঠনের সে জোর নেই।

—কি করলেন তখন?

—মেদিনীপুর চলে গেলাম। জেলার নেতা রসিক বেরাকে বললাম ঘটনা। লোকটা চা আর বিড়ি খেয়ে দিন কাটাতে পারত। আমরা বললাম, জনতার মধ্যে সাড়া জাগছে। এখন যদি কোথাও মারদাঙ্গা হয়, পুলিশ তো আসবে। যারা আমাদের মুখ চেয়ে আছে, তাদেরকে কি বলব? পড়ে মার খাও, না প্রতিরোধ করো? আপনি কলকাতা যান, জেনে আসুন।

—আপনাদের বাধা দিত পুলিশ? আপনারা তো যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন।

—তা ছিলাম, ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ। সরকার তা জানত। কিন্তু

কৃষকদের সচেতন করার কাজে সরকার আমাদের ছেড়ে দেবে কেন ?

—তারপর ?

—মেদিনীপুরে দুটো দিন গেল। দুই দিনেই অবস্থা পালটে যাবে কে জানত ? ফিরে দেখি বেঙা বেঙির মুখ থমথমে। ওরা বলল, হরগোবিন্দ পাঁজা ভীষণ হুমকি দিচ্ছে। থানা পুলিশ এসেও আসলামদের শাসিয়ে গেছে। বলে গেছে, সমঝে চলো, নইলে বাপের বিয়ে দেখিয়ে ছাড়ব। কাওয়ামারা করে দেব। আসলাম ভয় পেয়ে দৌড়ে এসেছিল।

—কাওয়ামারা কি ?

—জন্ম যাযাবর এক সম্প্রদায়। কাক মারে, পাখি মারে, শ্মশানের কাছেও থাকে। অবিরত ঘুরে বেড়ায়। আসলামদের উচ্ছেদ করবে জেনে খুব চিন্তা হল।

—কি করলেন ?

—কে তখন রসিক বেরার জন্যে অপেক্ষা করে ! দৌড়লাম দেউলেশ্বরে। গ্রামের নাম দেউলেশ্বর, কিন্তু পটুয়ারা থাকে দূরে, দেউলেশ্বর—পোটোপাড়ায়। পথে খাল আছে, ছোট একটা নদীও পড়ে। মাঝপথে লেঠেল রাম পা পিছলে পড়ল একবার। ধানক্ষেতে, আমবাগানে সময় কাটিয়ে সন্ধের পর উঠলাম যেয়ে আসলামের ঘরে। ওর কথাগুলি আজও মনে আছে।

—আপনার স্মৃতিশক্তি অসামান্য।

—বলতে পারো···তবে এটা একটা দুঃসহ বোঝাও বটে। কত কথা ভুলে যেতে চাই, পারি না। সব কি মনে আছে ? না, তা নেই। কিছু কিছু কথা···বড় বেদনা···বলার নয়। তা, আসলাম আমাদের সামনে মাথা নিচু করে বসে আছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ওর বাবা কালাচাঁদ সামনে বসে আছে।

—তারপর ?

—ও বলল, কমরেড ! পুলিশ শাসায়, জমিদার শাসায়, আমার বিনতি শোনে না কেউ। আপনাদের কথা বললাম, ওঁরা ভালো

লোক, আমাদের ভালোবাসেন, বিন্নতি শোনে না কেউ। কি করব বলে দিন।

—কি বললেন ?

—কি বলব ! নিজেকে মনে হচ্ছে আসামী। বুক ভেঙে যাচ্ছে। আমাদের উপর বিশ্বাস রেখে, আমাদের কাজের উপর বিশ্বাস রেখে এক গ্রামীণ পটুয়া কৃষ্টিবাহিনী তৈরি করার ক্ষেত্র তৈরি করছে। অত্যাচারের ভয়কে সে উপেক্ষা করতে পারে। অথচ আমি বলতে পারছি না, ঠিক আছে আসলাম। আগাও, ভয় নাই।

—বড় দুঃসহ অবস্থা।

—লেঠেল রাম ছিল বাস্তববাদী এবং অনন্ত আশাবাদী। ওই যা বলার, তা বলল।

—এখনো সে রকম আছেন।

—দেখতে ইচ্ছা করে। তারপর···ও বলল, আসলাম! সবই ঠিক আছে। তোমরা আমাদেব, আমরা তোমাদের, তবে এ সব এলাকা মাব খেয়েছে নানা ভাবে। জমিদারে-পুলিশে গলাগলি। যে জাগরণ তোমরা ঘটাচ্ছ, তাতে মানুষের চোখ খুলছে। শাসক আর শোষক, সরকার ও জমিদার, কোনো দিন চাইবে না যে মানুষের চোখ খুলে যাক। মানুষকে অন্ধকারে রাখাই ওদের কাজ। হরগোবিন্দের দাদা বেয়াল্লিশের আন্দোলনে জেলে গেছে। হরগোবিন্দ জমি-ভূমি দেখছে। দেশের কাজে জেলে গেছে, কিন্তু দেশের মানুষের জন্য ধানের গোলা খুলে দেবে না। আজ মানুষ সচেতন হচ্ছে। সে নিজে মারমুখী হতে পারে। আবার জমিদার নিজেও লেঠেল নামিয়ে মারদাঙ্গা করে তোমাদের দোষ দিতে পারে। পুলিশ তো আসবেই। তখন তোমরাই বলবে, আপনাদের কথা শুনেছিলাম বলে আমাদের এত শাস্তি সইতে হল।

—মেনে নিল সব কথা ?

—নম্র নরম মানুষ, চোখ দুটো যেন কথা বলে। আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। ভাবখানা, তুমি কিছু বলো।···আসলাম! ও

আমাকে একটা বানর গড়ে দিয়েছিল। তা আমি বললাম, বুদ্ধি করে চলতে হবে। সংগঠন গড়ছি, এখন চোট এলে মানুষ পিছিয়ে যাবে।

ও বলল, বুদ্ধিটাই বলে দিন। আমি বললাম, নতুন পট নয় তুলে রাখো। যা দেখাতে চাই তাই দেখাও। এ ভাবে কিছুদিন চললে ওদের সন্দেহ চলে যাবে। ও বলল, সভা হলে যাব না? আমি বললাম, তা কেন যাবে না? ওর বাবা বলল, আমার কথা ও গাধা শোনে না। গ্রামের হাটে পট দেখালি, গান করলি, তাতে না পাঁজা-বাবু সব জানল। নইলে তো জানত না।

—আসলাম তাই করেছিল?

—নিশ্চয়। ও বলল, হাটেই তো লোক জমে। সেখানে দেখাব না? আমি বললাম, আসলাম! এখন দেখাবে না। অন্যদেরও বলে দিও কথাটা। তুমি কর্মী, এটা তোমার কাজ। সব শুনে গেল চুপ করে। তাবপর·· এটাই খুব মনে বেজে আছে···ভাত—পান্তা যা হয় খেয়ে তো শুয়েছি। রাতে ঘুম ভাঙতে দেখি আসলাম কুপি জ্বেলে পট বিছিয়ে বসে আছে। বলি, কি করছ তুমি?—ও বলল, পটগুলি বেছে রাখছি কমরেড। সরিয়ে রাখব। আজ না হোক, কাল তো কাজে লাগবে। আমাব মনে হল, কি আশ্চর্য প্রাপ্তি, ওর এই বিশ্বাস।

—চলে এলেন?

—হ্যাঁ, ভোর রাতেই দেউলেশ্বর ছাড়লাম। সে সময়ে সংগ্রাম হলে ওরা মার খেত, এটাই বিবেচনা ছিল। সশস্ত্র সংগ্রাম বিষয়ে পার্টির তো তখনো কোনো নির্দেশ ছিল না, আমার যেমন মনে পড়ে। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামই তো হয়েছিল···তেভাগায় ··এখন কাকদ্বীপ-তেভাগা নিয়ে নানা মত শুনি। তবে···রসুলের বই পড়ে যা তখন বুঝেছি···আমার নিজের অভিজ্ঞতায় যা মনে হয়···পার্টি কোনো সিদ্ধান্তকেই কি যথার্থভাবে রূপ দিতে পেরেছিল? ওই কৃষকবাহিনী গড়াই বলি···তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশের সে সব হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী ···আবার তেভাগা এল যখন, আমরা কি সঠিক নেতৃত্ব দিলাম?

—কৃষ্টিবাহিনীও হল না ?

—ওই একই ইতিহাস। আমাদের নেতৃত্বে আন্দোলন অনেক হয়েছে নিশ্চয়। সে আমাদের কৃতিত্ব, না তাদের ? মানুষ এগিয়ে আসতে চেয়েছে বলেই আমরা যেয়ে তাদের কাছে সাড়া পেয়েছি। এটা বলা যায় যে যুগান্তের ভয়-ভীতি-শোষণ-শাসনে তাদের মনে প্রথমে কিছু দ্বিধা থেকেছে, কিন্তু তারপর তো তারা এগিয়ে এসেছে সব বাধা উপেক্ষা করে। জনগণ চিরকাল এগিয়ে গেছে বন্যার বেগে। আমরা সে বন্যাকে বাঁধ বেঁধে ধরতে পারিনি, সে বাঁধ থেকে সেচখাল কেটে দেশকে বাঁচাতে পারিনি। আজ তো তাব দাম দিচ্ছি সবাই মিলে। গণসংগীত, গণসংস্কৃতি, সব দেশের মাটিতেই ছিল। সে সকল কর্মকে কাজে লাগানো যেত। এতদিনে তারা দেশের মাটিতে নতুন করে বিকাশ পেতে পারত। আজকের মতো স্বীকৃতি পাবার জন্য শহরের ভরসায় থাকতে হত না। শহরে একদিন আসর, বাঁচতে হবে তো গ্রামেই।

—সব কি শেষ হয়ে গেছে ?

—আছে, মরে মরেও বেঁচে আছে। কিন্তু দেশজ সম্পদকে আমরা সম্পদ বলেও চিনলাম না, সে সম্পদকে উপযুক্ত সম্মানে ব্যবহারও করলাম না। দেখ না স্বভাবজ বনভূমি শ্মশান। বন সৃজন মানেই ইউক্যালিপটাস।

—গাছটা তো অর্থকরী।

—কাকে বোঝাই! যার এত জমি আছে যে কয়েক বিঘায় চাষ করতে পারে, তার কাছে অর্থকরী। যে লোক পাঁচ-সাত বছর জমি ওই কাজে ফেলে রাখতে পারে তেমন কৃষক ক'জন ? সমস্যা তো ভূমিহীনের। যে গাছ ফল-কাঠ-পাতা দেয়, তেমন গাছ লাগাও, তবে উপকার। বোঝায় কে ? আসলে ধনী দেশগুলিতে কাগজ তৈরীর কাঁচা মাল লাগবে, গরিব দেশে ওই গাছ লাগাও। বুঝেও বোঝে না।

—তারপর চলে এলেন ?

—না। কর্মক্ষেত্রে পড়ে আছি। মনটা খুব বিষণ্ণ, রসিক বেরা সবে মারা গেছেন, হেমচন্দ্র সামন্ত তখনো তেমন পোক্ত নয়···কয়েক বছর বাদের কথা · তো আমার কাছে চলে এল বামলাল খাটুয়া।

—রামলাল খাটুয়া?

—হ্যাঁ, মাহিষ্য জাতি, পদবী ওদের বিচিত্র। ওর কথাটাই বলব তোমাকে। আরেকটা রামলাল আমি তো দেখলাম না। ও একমাত্র লোক, যার গানগুলি ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আমি রক্ষা করেছি।

—এখন উনি কোথায়?

—তাই কি জানি? কয়েক বছর আগে ওর গানগুলি ছাপালাম স্বখরচেই। বনগাঁতেই ছাপতে হল। রেজেস্ট্রি ডাকে ওর যে ঠিকানা জানতাম, পাঠালাম। এ. ডি. ফেরতও এল। জলে ধুয়ে একাকার। ওর সই পড়তে পারলাম না।

—লিখতে জানতেন?

—না। তবে গ্রামে অন্য মানুষ তো আছে। তারা যদি··· চিঠি লিখলাম, উত্তর নাই, বেঁচে আছে কিনা, তাও জানি না।

—আসলামরা?

—ওই গ্রামে তো নেই। সেই উচ্ছেদই হল। কোথায় যে গেল, জানি না।

—আপনার কি মনে হয়?

—মায়ের যক্ষ্মা ছিল। ঘরে রামছাগল বাঁধা থাকত। হয়তো যক্ষ্মাতেই মারা গেছে।

—রামলালেব খোঁজ কোথায় পাব?

—রামলালের খোঁজ জানবে শুক্রা সিং, এক মুণ্ডা আদিবাসী। রামলালকে পাই ওর কাছে। শুক্রা সিং-এর গ্রামে যেতে হবে। সে কিন্তু হাঁটা পথ।

—হাঁটতে আমি খুব পারি।

—ওর কথা কাল বলব। রামলাল খাটুয়া, গণকবিয়াল। একটা আবিষ্কার বটে। এখনো ভাবি।

সুরো এসে দাঁড়ায়। অপ্রসন্ন গলা।

—আজ কি হরিমটর? খাওয়াদাওয়ার কথা নেই। রাত তো দশটা হতে চলল।

—আমাদের এ ঘরেই দাও। হ্যাঁ সুরো, মশারি আছে? এখানে মশা তো···অথচ গ্রামে মশা ছিল না। নর্দমা না থাকলে মশা জন্মে না।

—মশারি থাকবে না? সেবারই কিনলাম।

উঠোনে নেমে হাত মুখ ধোয় সোম। গ্রহান্তরে এসেছে সে। এমন সব মানুষ। এমন সব ইতিহাস, সবই ওর অজানা। বাবা থাকলে অনেক জানা যেত। সোমও মোটামুটি একটা সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে বড় হতে পারত। মায়ের চাপিয়ে দেওয়া মূল্যবোধ, জয়ির জেট-এজ মূল্যবোধ। কিছুই তো সোমের ভিতরকে প্রভাবিত করে নি।

কি শীতল জল, কি কাছাকাছি আকাশ, খড়বিচালির গন্ধ, কোনো ফুলের তীব্র গন্ধ। বাবা আন্দোলন করেই মারা যান, এটাও জানা ছিল না।

গরম ভাত, কাঁঠালবিচি সিদ্ধ, আলু সিদ্ধ, মান সিদ্ধ। সুরো একবাটি ঘন দুধ নামিয়ে দেয়।

—আমার গোপালীর দুধ।

ভোলানাথ বড় বড় গরাসে খান।

—দেখ, আমার খাওয়ার সময় আটটা। দশটা বাজে শুনেই ঘুম ধরেছে। এতক্ষণ কথা বলছিলাম, ঘুম ধরে নি। আমার দিন সূর্যোদয়ে শুরু, সূর্যাস্তে শেষ।

সুরো বলে, ঘুমটাও তো দরকার।

—ছেলেরা কোথায়?

—খেয়ে শুয়ে গেছে।

—রাতে যদি ওঠো সোম, ভেতরের দাওয়াতেই বাইরে যেও। বড় ভয়ভীতি বেড়েছে।

—কিসের ভয় ?

--ডাকাতের ভয়টা খুব··

সোমের মনে হয় খেতে পারবে না। কিন্তু সবই ও খেয়ে ফেলে। জয়িকে নিয়ে যদি আসতে পারত ?

নদীপথে আসা, হেঁটে ঢোকা, সব কিছুকেই জয়ি বলত, ট্যু সুইট। গাছ দেখে বলত, লাভলি। কিন্তু কয়েক ঘণ্টাতেই বলত, চলো। এখানে কোনো লাইফ নেই।

না, জয়িকে এখানে আনা যেত না।

কোনো বাড়ি থেকে হিন্দী গান বাজতে শুরু করে, বেরিলি কে বাজার মেঁ ঝুমকা গিরা রে !

ভোলানাথ বলেন, ভোলানাথ দত্তকে দেখে মানুষ ঘড়ি মিলায়। আটটায় খাব, ন'টায় ঘুমাব। দশটা বাজে শুনেই চোখে ঘুম আসছে। আজ যে কি হয়ে গেল !

সুরো বলে, একদিন এমন অমন হবে না ?

ঝুমকা গিরার গান আছড়ে পড়ে বার বার।

ভোলানাথ বলেন, সদাসর্বদা আমদানি-রপ্তানি হে ! সীমান্ত এলাকা। চলে যাচ্ছে গরু-মোষ-ছাগল-চাল-লুঙ্গি-কাপড়। আসছে টর্চ-ঘড়ি-ক্যাসেট প্লেয়ার-জামাকাপড়। সাহেবদের উচ্ছিষ্ট জামা কাপড় যতো।

সুরো বলে, দাম কম, কাচতে সুবিধা।

—তাও বটে ! যাক, আমার বাড়ি গাছে ঘেরা বলে গানের উৎপাত কম আসে কানে। সুরোর ছেলেদের ইচ্ছা খুব। আমি বলি, এতটুকু সবুর করো। আমি চোখ বুজলে কিনো।

সুরো বলে, ও কথা থাক। আপনি বিশ বছর থাকুন। আপনি আছেন, বটবৃক্ষের ছায়ায় আছি।

—নাও, ওর বিছানা করে দাও।

—কখন পেতে রেখেছি।

—বিছানায় টর্চ, ঘরে হেরিকেন, এক গেলাস জল।

টর্চ জ্বেলে দেখে শুনে নামবে। সাপখোপ···তবে তেমন আসে না। কোথায় পড়েছিলাম, তা ঘরের মাটি ঘেঁষে কৃষ্ণতুলসী, ঈশের মূল গাছ লাগিয়েছি। সাপ ঘেঁষে না।

—কার্বলিক অ্যাসিড দিলে পাবেন।

—পাব কোথা?

একটি খাটিয়াতে মোটা কাঁথা পেতে, সুজনি ঢেকে, খুব শক্ত বালিশ দিয়ে সোমের বিছানা। হাটে কেনা শস্তা নাইলনের খড়খড়ে মশারি।

প্রথমটা মনে হয় ঘুম হবে না। কিন্তু চোখ বুজতে না বুজতে সোম ঘুমিয়ে পড়ে।

॥ ৬ ॥

সোমের যখন সকাল হয়, তার অনেক আগেই ভোলানাথ উঠেছেন। স্নান ও প্রাত্যহিকী সেরেছেন, দুধ ও চিড়ে খেয়ে বসে আছেন। সোম লজ্জা পায়। বিছানা তুলে ফেলে। সুরোর গোপালি ডাকছে। গাছের পাতায় রোদ।

—খুব ঘুমিয়েছ কাল।

—অনেক কাল বাদে এমন করে ঘুমোলাম।

—কলকাতার জীবন! সর্বদা মাথায় চাপ, সর্বদা নানা চিন্তা। ঘুম কি হয়?

—এমন শান্ত পরিবেশ কোথায় পাব?

—তুমি ঘুমোচ্ছিলে, আমি দেখছিলাম। বাপের সঙ্গে খানিক মিল আসে। অশোকবাবু ফর্সাই ছিল। তবে পার্টির কাজে ঘুরে ঘুরে রং জ্বলে যায়। তার ক্ষমতা ছিল, সর্বাবস্থায় ঘুমাতে পারত। বর্ধমানে পিছনে লেগে গেল পুলিশ। সে লোক ট্রেনে বসে দিব্যি ঘুমিয়ে নিল। কি কথাবার্তা, কি হাসি!

—বাবার কথা আমার মনে নেই।

—থাকার কথাও নয়।

—একবার এসে বাবার কথা শুনব।

—একবার কেন, দশ বার এসো।

—আমি এখনি আসছি।

—পিছনের বাগানে চলে যাও। আমরা তো বাগানেই যাই আর মাটি চাপা দেই। কুয়ো পায়খানা কাটালাম, ব্যবহার করে না কেউ। স্নানের পুকুর তো দেখেইছ।

—আমার সবরকম অভ্যাস আছে।

—সাঁতার জানো?

—তা জানি।

বাগান থেকে ঘুরে, স্নান সেরে চলে আসে সোম। তার জন্য তৈরি চা, চিড়ে ভাজা, বড় বড় কলা।

—খাও খাও, আমার গাছের কলা। আমরা খাই, বিলাই, বেচি। কলাগাছ বড় ভালো গাছ। ফল দেয়, থোড় দেয়, মোচা দেয়, পাতা দেয়। আরেকটা খাও।

—এত খাওয়া যায়?

—সুরো আজ তোমাকে মাছ খাওয়াবে।

—ও-বেলা রাঁধব মাছ। হাট থেকে আনবে তবে তো? হাটে বা কি পায়!

—এ-বেলা কি খাওয়াবেন?

—খাওয়ার কালে দেখবেন।

সুরো চলে যায়।

—এত খাটেন, ওঁর বয়স কত?

আরে বয়স তো কম। ষাট-বাষট্টি হতে পারে। ছেলেরা সাহায্য করে। বাগান পরিষ্কার, কাঠ পাতা জোগাড়, ঘরের চাল মেরামত, রাঁধা খাওয়ার জল আনা, মোষের বিচালি কাটা, গোহাল ধোয়া, সব করে। সরোজ ভালো টিউবওয়েল মিস্ত্রিও বটে। পঙ্কজ আশাবাড়িতে রিকশা চালাত, মালিকের সঙ্গে বনল না। ওকে

মুরগি পালন ট্রেনিঙে পাঠাব। ছোটখাট পোলট্রিও লাভজনক। ছেলেটা খাটুয়ে আছে।

—যাক, চাকরির ঝোঁক নেই।

—চাকরির বাজার খারাপ। ঘুষ দিয়ে চাকরি মেলা বড় কঠিন। সুরোর দুটো ছেলে চাকরি নিয়ে সরে গেল। সুরো এদের ছাড়তে চায় না। আমি বলি, এখান থেকে তো সরে যেতে হবে না। ভাইরা যে-যার অংশ বেচে চলে গেছে। এটা তো আমার। আমিও সুবোর নামে লিখে পড়ে দিয়েছি, যাকে বলে উইল। ওদেরকে কেউ সরাতে পারবে না।

—এটা আপনাদেব পৈতৃক সম্পত্তি?

—প্রপিতামহ করেছিলেন। বনগাঁয়ে মুহুবি ছিলেন, এটা ওঁব শ্বশুরবাড়িব গ্রাম। আমি তো ঘব ছেড়ে চলে যাই। জীবনে ভাবিনি যে ফিরব। এখানেই যে মাটি মাপা আছে তা কি জানতাম?

—মেশিনটা রেডি করব?

—হ্যাঁ···রামলাল খাটুয়ার কথা

—আপনি সহজভাবে বলে যাবেন। আমি আঙুল তুললে থেমে যাবেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে তবেই আঙুল তুলব আমি।

ভোলানাথ একটু একটু দোলেন। চোখ নিবিষ্ট হয়ে যায় ভাবনায়।

—চালাও মেশিন।

—চালালাম।

—পূর্বের কথা খানিক বলতে হয়। রামলাল খাটুয়াকে প্রথম দেখলাম, তখন ওর বয়স বছর তিরিশ হবে।

সময়টা ১৯৪৭ সালের শেষাশেষি। আমি, লেঠেল রাম, আমরা তখন মগনাদি গ্রামে আছি। মনে রাখতে হবে, বাংলায় অন্যত্র যখন তভাগা আন্দোলন শেষ হয়ে এসেছে, কাকদ্বীপে আন্দোলন কিন্তু থামেনি।

মগনাদি গ্রাম নারায়ণগড় থানায়। বর্তমানে নেই। ওকে নিয়ে

এল শুক্রা সিং। মুণ্ডা আদিবাসী। ওখানে মিলেমিশে বাস করে, বাংলা ভালই বলে। এসে বলে, বাঁধনা পরবে যাবে তোমরা। ডাকতে এসেছি। বাঁধনা ওদের খুব বড় পরব। মেদিনীপুরে কাজ করতাম, কিন্তু রসিক বেরা, বা ভবসিন্ধু দাস, এঁদের মতো সাঁওতালী বা মুণ্ডারী বলতে পারতাম না। কেননা আমরা বাংলাভাষী এলাকাতেই কাজ করতাম।

ভবসিন্ধু দাশের কথাতেই মগনাদি আসা। এখন বুঝতে পারি, ঝাড়গ্রাম, নয়াগ্রাম, নারায়ণগড়, শাঁকরাইল, এসব জাগয়ায় থাকিনি ও কাজ করিনি বলে আদিবাসী সমাজের সঙ্গে জানাজানিটা হয়নি।

তবে আমরা তো কাজ করতাম নির্দেশে। মগনাদিতে যাবার কারণ, কৃপাময় বেরা। ১৯৪৭-এ মেদিনীপুর জেলাতেই পাঁচথুরিতে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন হয়। তখনি কৃপাসিন্ধু বেরা বেশ অসুস্থ। আমবা নির্দেশ পেয়েই গেলাম। বেঙাবেঙি তো সঙ্গে আছে।

দেশমাতা ডাকে, দাও বলিদান!
চল ভাই সব! আগায়ে যাই!

এ গানটা মাতিয়ে দিত একেবার। তারপর ঘূর্ণিঝড় নিয়ে বলো, আন্দোলনেব পর সরকারের অত্যাচার নিয়ে বলো, আন্দোলনেব পর সরকারের অত্যাচার নিয়ে বলো, এমন সব গান বাঁধে যে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। ওই জন্যেই ওকে ধরে।

—তা, এখন তো ছাড়া।

—ছাড়া ও পেল এই তো সেদিন। খুব মার খেয়েছিল। রক্তবমি করে হাসপাতালেও ছিল।

—তা এনার সঙ্গে?

—স্বগ্রামে ওর আছেটা কি? বাপের কিছু জমিজমা ছিল কাঁথি থানায়। সেসব তো গেছে কবে। ও তার আগে থেকেই বাউণ্ডুলে। বর্তমানে কিছুকাল বিরগোড়িয়া গ্রামে দেখছি। তাও থাকবে না, চলে যাবে।

শুক্রা সিং বলল, আমরা ওকে ছাড়ব না।

গান গেয়ে জেলে গেছে এটা একটা অদ্ভুত, বিরল ঘটনা। রামলাল বলছে, হবিচক, নানকার চক ঘুরে এলাম। পটুয়ারা এখনো আপনাদের নাম করে। তা আপনারা তো কাজ করছেন, আমাকে কাজ দিল না। যা বলবেন, তাই গান বেঁধে দেব।

তখনো আমাদের ধারণা এ রকম, যে বিয়াল্লিশে জেলে গেছে, ও তো আমাদের সঙ্গে মিলবে না। ও সেটা বুঝতে পারছে। বলছে, অমন একটা ঘটনা! তা গান আমার এসে যায়। ও হাসছে না বাবু। গান যেখানে আমি সেখানে। গান নাই তো আমিও নাই। চলুন কেন পরবে আমিও গাইব ওবাও গাইবে।

কৃপাসিন্ধু বলছে, সব পারি শুক্রা, এত হাঁটতে পারি না। শুক্রা বলছে, আমরা পারি, তুমি পাব না কেন? নারাণগড়ে থাকবে, আর হাঁটবে না, সে কি হয়?

আর রামলাল তার নিজের কথা বলছে। আমার আর কথা কি? পিছাবনির নাম জানেন? পিছাবনি ছেড়ে পূর্বদিকে চাব ক্রোশ গেলে আমাদেব গ্রাম পোখারিয়া। মাহিষ্য-প্রধান গ্রাম।

তা, আমি জ্যেষ্ঠ সন্তান বটে! বাবা লেখাপড়াও কিছু শিখালেন। তখনি আমি গান বাঁধি, গান গাই। জমিদারদের পুকুর কাটতে পিতলেব লক্ষ্মীজনার্দন মূর্তি উঠল। তা নিয়ে গান বাঁধলাম জমিদার খুব প্রশংসা করল।

আবার প্রজা উঠাতে ধানক্ষেতে হাতি নামাল, ঘব ভাঙল। তা নিয়েও গান বাঁধলাম। তখন ওই জমিদারই কাছারিতে নিয়ে মারল, বাবাকেও শাসাল।

বাবার বুদ্ধি হল, যে বিয়ে দিলে ছেলে বদলে যাবে। একথা জেনেই ঘর ছাড়লাম। তখন ধরেন, ষোল বছর বয়সই হবে। ঘুরতে ঘুরতে আশ্রয় পেলাম শ্রীনন্দ দলুইয়ের বাড়ি। উনি খুব বীরেন্দ্র শাসমলের ভক্ত, বেশ তেজস্বী লোক।

উনি আশ্রয় দিলেন। ক্ষুদিরামের গান, তো চলে খুব, তুমিও

বাঁধো। লবণ নিয়ে এত ঘটনা, গান বাঁধো। গান বাঁধি, গান গাই, কিন্তু ঘরে তো ভাল লাগে না, হাটে হাটে ঘুরতে থাকলাম।

ঠাকুর দেবতার গানও গাই, ওই সকল গানও গাই, দোকানীর চালায় থাকি, খেতেও পাই। এই ভাবে চলছে বাবু! তা জেল থেকে বেরিয়ে যাব কোথা! পোখারিয়া? এত কাল বাদে? মেদিনীপুরেই শুনলাম, ও অঞ্চলে খুব অত্যাচার, বাবাদের হয়তো তাড়িয়েই দিয়েছে।

এতকাল বাদে সেখানে যাব? মেদিনীপুরে আমার গান শুনে ওই কৃপাসিন্ধুবাবু বলল, তুই নারায়ণগড়ে আয়। বলল তো চলে এলাম। মগনাদিতে আছি। গান শুনে শুক্রা সিং বলছে আমাদের গ্রামে চলো। যে যেমন বলে, চলে যাই বাবু। তবে আপনাদের কথা আমি চিত্রকরদের কাছে শুনেছি।

আমি ভাবছি, কৃষ্টিবাহিনী থাকুক, না থাকুক, এমন লোকটাকে ছাড়া হবে না। ওকে দিয়ে আমি সম্মেলনে গাওয়াব। তখন কি জানি, যে তেভাগার কারণে হোক, কাকদ্বীপের কারণে হোক, স্বাধীনতার পরেও উদ্বাস্তু ও অন্য সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের কারণে হোক, সম্মেলন কয়েক বছর হবেই না। কিছু না জেনেই বিরগেড়িয়া পৌঁছলাম।

মালিগেড়িয়া, ফুলগেড়িয়া, বিরগেড়িয়া, তখন সেসব জায়গা বনাঞ্চল বললে হয়। আমার চোখের সামনেই সব ধু-ধু মাঠ হয়ে গেল। সব ধু-ধু! অথচ মেদিনীপুর একদিন জঙ্গলমহালের বিদ্রোহে, সেই অষ্টাদশ শতকেই শামিল হয়েছিল। আজ, আমার চেনা সব জায়গাই এমন হয়ে গেছে, যে ভাবলে দুঃখ পাই।

বিরগেড়িয়াতে সব চেয়ে প্রথমে চোখে লেগেছিল, একটি গাছ ওদের গ্রামদেবতা। তার নিচে মানত করা মাটির হাতি ঘোড়া।

—কোথায় থাকলেন?

—ওদেরই ঘরে। রামলালকে বলছি তুমিও ওখানে থাক? সে বলছে, এখন তো আছি। স্বজাতি এ-গ্রামেও আছে, তবে ওদের

সঙ্গে থাকি, খাই বলে তারা···হ্যাঁ, গ্রামে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে তখনো আদিবাসীদের সম্পর্কে বাছবিচার ছিল। এতদিনে গেছে কিনা বলতে পারি না।

কৃপাসিন্ধু বলল, চমৎকার পুকুর আছে। হাত-মুখ ধুয়ে নাও। আজ সারা রাত ধরে ওরা গরু জাগাবে। মানে গরুকে নিয়ে আনন্দ করবে। ঘরে ঘরে ধমসা মাদল বাজিয়ে গান গাইবে নেচে নেচে, সারা রাত।

বাঁধনা বা সহরায় গরুকে নিয়ে উৎসব। চাষীর জীবনে গরু বা মোষ যে কতখানি তা কি করে বোঝাই। এখন তো সাধারণ চাষীর আর কেনারই ক্ষমতা নেই।

কৃপাসিন্ধু খিচুড়ি চড়াল। আমরা খেয়ে-দেয়ে দাওয়ায় বসেছি। রামলাল বলল, আমি যাই। আপনারা তো গান শুনবেন।

বল কি গান! কি গান! ধমসা মাদল বাজিয়ে ওরা গান গাইতে গাইতে আসছে। বাঁধনায় যা প্রচলিত গান তা গাইছে—

ওই রে রে রে রে বাবু হো
ওই রে রে রে রে
জাগো মা ভগবতী জাগো মা লক্ষ্মী
আজ তো বাঁধনা পরব গো মা!

তারপর গাইছে রামলাল—

জাগো মা ভগবতী জাগো মা ভগবতী
সন্তানরা ডাকে গো মা!
সন্তানরা দুঃখী অতি
ইংরাজ তাড়াতে তারা হাতিয়ার ধরে
পুলিশের গুলি চলে সন্তানদল মরে
জাগো মা!
সমুদ্দুরে ঝড় এল
বান বন্যা সাথে এল
কত শত সন্তান যে মরিল গো মা!

সাথে সাথী মন্বন্তর দুরন্ত আকাল
চাষী মরে ভাত বিনা
বাবুর গোলায় চাল !
বিদেশী শাসন গেল স্বাধীন শাসক এল
তবু দেখ তোমার সন্তান উপবাসে মরে !
জাগো গো মা ভগবতী,
তুমি কৃষকের গতি
তুমি না জাগালে
বলো কে বাঁচাবে তারে ?

এরপরে এ গান শত-শত পুরুষ গাইছে আর ওই রে রে রে বাবু হো ! মাঝে মাঝেই আসছে।

আমরা অবাক হয়ে শুনছি। বলছি, ও কি সারা রাত গাইবে ? শুক্রার মা বলছে, আমাদের ছেলেরা পারে, ও পারবে না ? এখন বিরগেড়িয়ার গানের নাম কত ?

কৃপাসিন্ধু বলে, আমরা তো জানি। এরা জানে না, এরা শুনুক।

তো আমি বলছি, একে তখন কেন এনে দাওনি।

—জেলে ছিল না ?

এই গান চলল ঘরে ঘরে, ঘুরে ঘুরে। আমরা এক সময়ে ঘুমিয়ে গেলাম। সকালে দেখি রামলাল বসে আছে। বলছে, চলুন, নদীতে যেয়ে স্নান করি। ছোট নদী, কিন্তু জল খুব ভালো।

আমরা শুনলাম, দিনের পাটপরব আমরা দেখিনি। দিনে ওরা বাঘুত দেবতার পুজো দিয়েছে। এই দেবতা বাঘের হাত থেকে গরুদের বাঁচান। পূজার শেষে ঠাকুরথান দিয়ে গরুদের আনা হয়েছে। ঠাকুরথানের সিঁদুরমাখা পাতা যার গরু আগে খেয়েছে, সে সকলকে ভোজ খাওয়াবে একদিন। আর রাতে ঘরে ঘরে গরু জাগানো হয়েছে, প্রতি ঘর থেকে চাল বা পয়সা মিলেছে। সেসব একত্র করেও গ্রাম ভোজ হবে।

আজ বিকালে গোহাল পুজো। দেখলাম, গোহাল থেকে আঙিনা

আলপনা আঁকল। মাঝে মাঝে গরুর খুরের ছাপ। শুক্রার মা বলছে, ভগবতীর পূজা! তা দেখ এই সঙ্গে ধরম ঠাকুরের পূজা হচ্ছে, লাল মোরগ বলি দিব। হাড়াম বুড়ির পূজা হচ্ছে, কালো আর সাদা মুরগি বলি দিব।

পূজার পর খাওয়া-দাওয়া বিকালে মাঠে গরু ঘুরানো হল। গরুর শিঙে তেল-সিঁদুর দিয়ে মেয়েরা গান করছেন।

তারপর রামলালের গান—

ওই রে! কনেকা (কায়) বলদ ভালা ক্ষেতে ঘুরায় রে! মানে ···এটা প্রচলিত লাইন। রামলাল গাইছে,

কার ক্ষেতে ঘুরায় বলদ,
কার ক্ষেতে ঘুরে
সে হি বলদ ভালা যে
চাষীর ক্ষেতে ঘুরে
কার বলদ বাঁয়ে ঘুরায়
কাহার বলদ রে!
তেলির বলদ ভালা,
বাঁয়ে ঘুরায় রে!
কোন তেলির ঘানি বলদ
জমিদারে নিল!
কিষ্ট তেলির ঘানি বলদ
জমিদারে নিল!
কিষ্ট তেলি বলে চলো
থানা দখল করি
দারোগা রহিম তারে
দিল জানে মারি!
বিয়াল্লিশে এত হল,
কিষ্ট তেলি মরে গেল

জমিদারে তার বলদ

বাঁয়ে ঘুরায় রে !

কার বলদ ভালা,

স্বর্গেতে ধূলি উড়ায় রে !

ব্যাপারীর বলদ ভালা,

শূন্যে ধূলি উড়ায় রে !

এদিনও গানে গানে গেল। পরদিন ঘরে ঘরে গুরুজনদের নিমন্ত্রণ। সকলে সকলকে প্রণাম করছে, আশীর্বাদ করছে, নিচ্ছে। বিকালে শুরু হল বাঁধনার শেষ পর্ব।

গ্রামের পথে শক্ত খুঁটি পুঁতে শক্ত দড়ি দিয়ে গ্রামের সকল গরু-মহিষকে বাঁধা হল। এবারে নেচে নেচে, ধমসা মাদল বাজিয়ে, গান গেয়ে ঐ গরু মোষকে নাচানো হচ্ছে। সে নাচের মাতন কি! উল্লাস কি! আমি চোখ রেখেছি রামলালের উপর। প্রচলিত গান একটা আজও মনে আছে—

ওই যে বুনোলি বাবু হে !

মুগ যে বুনোলি বাবু হে !

হনু তো জাহি জাহি খাওয়ে

হনুকে মার রে হনুকে পিট রে

তারি ছালে বরদা খেলাবে ॥

এই গানে বাবু মানে বাছা! রামলালের গানে তা নয়। সে গাইছে—

নদীয়ার ধারে ধারে

মুগ যে বুনিলি ভাই

জমিদারের পেয়াদা সেথা ঘুরে

কেন ঘুরে ভাই !

বুনতে দিবে, কাটতে দিবে না !

জঙ্গল হাসিল করে

ধান যে বুনিলি ভাই ! মহাজনের

লোক সেথা ঘুরে
কেন ঘুরে ভাই ?
বুনতে দিবে, কাটতে দিবে না !
হা রে চাষী ! বুদ্ধিনাশী !
বুদ্ধি করো ভাই !
ওরাদেরকে
ঘেঁষতে দিও না !

বিরগেড়িয়াতে সে রাতটা আমি কখনো ভুলব না। রামলাল আর আমি !

—তুমি ওদের উৎসবের গানের মধ্যে নতুন বক্তব্য ঢোকাচ্ছ কেন ? কি জন্যে ?

—দেখুন, ওরা খুবই সরল, বিশ্বাসী, ওদের ঠকানো খুব সোজা। জমিদার, মহাজন, শুঁড়ি, সবাই ওদের ঠকায়। এখনো ওদের অনেকের হাতে জমিজমা আছে। কিন্তু কর্জ তো নেয়, সাদা কাগজে টিপ দেয়···

—ওদের সচেতন করার জন্যেই ?

—তাও নয় সবটা। ওরা যে একেবারে বোঝে না তা নয়। তবু লেখাপড়া জানা কৌশলী মানুষদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। খুব ভয় করে।

—কেন ?

—কতবার উচ্ছেদ হয়েছে, হয়তো আবারও হবে।

—ওদের সচেতন করার জন্যেই ?

—বাবু ! গানের জন্যে ! দেখুন, ওদের, সাঁওতালদের, জীবনে গান কথায় কথায়, পালাপরবে তো বটেই। আর আমাদের কি ? আমাদের জাতে চাষীবাসী লোকও তো এত গান গায় না। তাতে আমার মনটাও ভরল, আবার গানে নতুন কথা বলার সুযোগও পাচ্ছি।

—ওরা আপত্তি করে না ?

—না। আমি ওদের ঘরে থাকি, খাই, আমার কোন ধান্দা নেই, ওরা খুব সহজে বিশ্বাস করে। গানের মধ্যে দুঃখের কথা ওরাও বলে। সেই যে শুনেছিলাম—

যত ছিল টাকাকড়ি
কেড়ে নিল লখ্যা শুঁড়ি
এখন কি হবে উপায়!
অন্ন বিনা কেঁদে পরাণ যায়॥

বুঝলেন না? শুঁড়ি ওকে ধারে মদ খেতে দিয়েছে, ও সাদা খাতায় টিপ দিয়ে মদ খেয়েছে। ব্যস্, একদিন পথের ভিখিরি হল। এটা আমি পুরুলিয়াতে শুনেছি বাবু! যাবেন সেখানে। তাদের ভাদু, টুসু, এসব গানে অনেক সত্যি কথা পাবেন।

সোম! আমি তোমাকে মন থেকে বলে যাচ্ছি। কথাবার্তা ওইরকমই হয়েছিল। কিন্তু প্রতিশব্দ কি ঠিক ঠিক বলছি? যা হোক, বক্তব্যটা তুমি বুঝে নিও।

তাহলে বলো, রামলাল খাটুয়া কত বড় কাজটা করেছিল। কত বড় কাজ ও করতে পারত? আমি তো কৃষ্টি কাজ করতে যাইনি। কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে গেছি। কিন্তু লোকসংস্কৃতির যেসব ব্যাপার কৃষকদের চেনা, তাকে গ্রামীণ শিল্পীকে দিয়ে কাজে লাগালে যে কি আশ্চর্য ফল মেলে, সেটা তো পটুয়াদের বেলায় দেখেছি।

আমরা যদি ওদের চিনতে পারতাম! কাজে লাগাতে পারতাম! কি মনে হয় জানো? আজ, এই বৃদ্ধ বয়সে, রাজনীতি ছাড়ার পঁচিশ বছর পরে মনে হয়, এসব কাজ করা হয়নি। কেন না আমরা করতে চাইনি। রমেশ শীল, হরিপদ কুশারী, এমন কয়েকটা নাম নিয়ে গর্ব করি, বা বলি, যারা জানি তারা বলি, কিন্তু সেই সঙ্গে বহু নাম যোগ হতে পারত। আমরা ওদের প্রকৃত সম্মান দিলে দেশের কাজ এগোত।

—আজ?

—আজ আর কি তা সম্ভব? কিছু খয়রাতি, কিছু অনুদান,

এতে কি হবে? লোকসংস্কৃতি বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, সুস্পষ্ট নীতি কোথায়? শুক্রা সিংরাই বলো, রামলালরাই বলো, সাধারণ মানুষকে আমরা ভিখিরি করে দিয়েছি মানসিকতায়। মানুষ মুখ খুলতে কি ভয় পায় দেখেছ?

—রামলালের সঙ্গে সেই শেষ দেখা?

—না, না, সে কথাতেও আসছি। ও বলল, আপনাদের কর্মসূচী দিন, আমি গান বাঁধব।

—আপনারা দেননি?

—না। তখন দেয়া সম্ভব ছিল না। তেভাগা আন্দোলন অন্যত্র ঝিমিয়ে পড়লেও, কাকদ্বীপে তা চলছিলই।

—সেখানে তো খুব জঙ্গী হয়।

—হ্যাঁ, পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে যা ছিল···রসুলের বই পড়ে নিও···তা হল দেশের স্বার্থে একই সঙ্গে পুঁজিবাদী শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসানের জন্যে বিপ্লবী সংগ্রাম চালানো, যাতে জয়ী হয়ে দেশে শোষণহীন অর্থব্যবস্থা ও সমাজবাদী রাষ্ট্র স্থাপন করা যায়।

পরের রায়টাও জানো বোধ হয়, যে এটা ছিল ভ্রান্ত, সংকীর্ণতাবাদী ও হঠকারী নীতি! এবং ১৯৪৮-এর মার্চের শেষেই কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হল।

কিন্তু তখনো তেভাগা চলছে, তো কাকদ্বীপে।···সোম! যারা আমাদের কথায় লড়ায়ে নেমেছে, তারা তো জানে না পার্টির এ নীতি হঠকারী ও সংকীর্ণতাবাদী বলে গণিত হবে। যেসব পার্টিকর্মী পার্টির নির্দেশেই ওখানে যান···যাঁরা অন্য নামে অন্য রাজ্যে চলে যান্···

—আপনার মনে অনেক ক্ষোভ।

—ক্ষোভ নয়, দুঃখ। সারা বাংলায় ষাট লক্ষ ভাগচাষী আর ক্ষেতমজুর লড়ায়ে নামল···তাদের মধ্যে কতজন মরল···ক্ষেত-মজুররা সে সময়ে একেবারে বঞ্চিত···আজ বা ক'জন সঠিক মজুরি পায়···

বর্তমানে এই যে অবস্থা…এটা হল আমরা আমাদের ভুলের জন্যে ভীষণ দাম দিচ্ছি।

—রামলালের কথা।

—হ্যাঁ, রামলালের কথা। সে সময়ে নির্দেশ মতোই আমরা কাকদ্বীপে চলে যাচ্ছি। রামলালকে কেমন করে সঙ্গে নিয়ে যেতাম? যাব কাঁথি, নৌকো করে চলে যাব, সেখানকার অবস্থা প্রকৃত জানি না। কাকদ্বীপ তেভাগারও তো দুটো সুস্পষ্ট পর্যায়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮ কেন, ১৯৪৯-এর খানিক অবধি তেভাগাই ছিল মূল দাবী। ১৯৪৯ থেকে…সমস্ত ধান আমাদের…লাঙল যার জমি তার · এই পর্যায়ে জঙ্গী হল আন্দোলন। এ পর্যায়েই ওখানে যান…পার্টির নির্দেশেই ··অশোক বোস। ওঁদের ছদ্ম নাম ছিল। সকলেই টেক নেম নিত। অবশ্য এখন বুঝি লাঙল থাকে জমিমালিকের। লাঙল যার, জমি তাদেরই ছিল।

—সে জন্য নিলেন না?

—সে জন্যই। ওখানে কবিয়াল নিয়ে ঢুকব কি করে? যাকে তখনো সম্পূর্ণ চিনি না, জানি না। তা সে তো নাছোড়বান্দা। বলে, ওখানে আপনারা কি করছেন তা বলুন।

কৃপাসিন্ধুকে জিগ্যেস করলাম আগে, বলব কি না? সে বলে কেন বলবে না? এতবড় আন্দোলন, এতজন শহীদ · কেন বলবে না?

সে এক আশ্চর্য রাত। বাঁধনা পরবের মাতামাতির পর বিরগেড়িয়া গ্রাম ঘুমোচ্ছে। বাতাস ঠাণ্ডা। গাছপালার পাতা শনশন। আমি, কৃপাসিন্ধু, লেঠেল রাম আর রামলাল বসে আছি চাদর মুড়ি দিয়ে নদী বলো নদী, নালা বলো নালার ধারে গাছের নিচে, পাতার আগুন জ্বেলে।

আমি, আমি কেন, আমরা…ওকে আবাদ অঞ্চলে কিরকম অবস্থা চলছিল, কত নামে শোষণ চলত…তারপর কিষাণ সভার ডাকে ওরা কিভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হল, তা বললাম। দিনাজপুর, চিরির বন্দরে ও

ধুমানিয়াতে, আরো অন্যত্র কতজন শহীদ হয়েছেন তাও যতটা পারি বললাম।

সে বলে, কাকদ্বীপে শহীদ হয় নাই?

বললাম, ১৯৪৭ মার্চে কারা শহীদ হয়েছেন।

—লড়াই তো চলেছে।

—হ্যাঁ।

—তবে আমি যাব না কেন?

—তুমি যেয়ে কি করবে?

—গান গাইব।

—তুমি তো কিষাণসভার সভ্য নও, চাষী, ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর, কিছুই নও।

—আমাকে নেয়া চলে না?

—না রামলাল।

ও চুপ করে থাকল।

—তুমি যা করছ, এটাও-খুব বড় কাজ।

—নয় না গেলাম, যদি গান বেঁধে দিই?

সে সময়ে কাকদ্বীপে গান বেঁধে দিলেও কে সুর দেবে, কে গাইবে, এসব ভাবছি।

—আমরা তো যে কোনো দিন চলে যাব।

—আর আসবেন না?

—আসব, আসব রামলাল। কথা দিচ্ছি আসব। এসে তোমায় পাব?

—কথা যদি দেন, তাহলে ঘুরে ঘুরেও এখানেই আসব।

তারপর শিশুর মতো হেসে বলল, কেনারাম সিং বলছে, নয় ওর কাছ থেকে একটু জমি নেব, ঘর বেঁধে নেব। পরে এলে আমার ঘরেই আসবেন।

—রামলাল! সুন্দরবনে···আবাদে···অনেক আদিবাসী কৃষক··· সেখানে আমরা আছি। কিন্তু এদের মধ্যে থাকে এমন কেউ নেই···

—এদেরকে আপনাদের কিষাণসভায় ডাকেন না কেন?

কৃপাসিন্ধু বলছে, আস্তে আস্তে হবে রে বাপু!

আমি বলছি, দেখ রামলাল! এসব জায়গা জমিদারী এলাকা। গান বাঁধো, ওদেরকে সচেতন করো, কিন্তু এমন কিছু কোর না যে তোমাকেই তাড়িয়ে দেয় জমিদার।

ও বলল, তা কেন? তা, মগনাদিতে মোটে থাকবেন না? আমরা বললাম, দু-চার দিন।

—আমি···ধরুন · পরশু একবার যাব!

—তেভাগা শুনে তোমার এমন হল কেন?

—কেন হবে না? বিয়াল্লিশে যদি রক্তে গান জাগতে পারে, এখন জাগলে দুয়ে বিবাদ কোথায়?

কথাটা যে কত বড়, ওর প্রাণটা যে সত্যি এক কবির, গায়কের, লোকশিল্পীর প্রাণ, তা পরে বুঝি, সেদিন বুঝিনি। কংগ্রেসের আন্দোলন আর আমাদের আন্দোলন এক হল? সেদিন এরকম ভেবেছি। . অনেক পরে বুঝেছি, হোক কংগ্রেসের আন্দোলন, ওই জনগণের প্রচণ্ড সাড়া, সংগ্রাম, সে খুব বড়ো। নিজেদের আমরা বড্ড বড়ো ভাবি···বড্ড বড়···বারোতলায় বাস করলে নিচের মানুষ দেখা যায় না···ভাবখানা আজও এই, সকলেরি, যা করেছি তা আমরা করেছি···অথচ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতক থেকে কত যে বিদ্রোহ ···তখন আমরা কোথায়? মানুষ, জনগণ, ভুল করে না। আমাদের একপেশে রাজনীতিই ভুল করে।

—ভুল তো শোধরানোও যায়।

—সে এদের দ্বারা হবে না।

—ভালোই হয়েছে আপনি রাজনীতি করেন না।

—করি না, বলি না কথা, গাছ লাগাই···

—সেই ভালো।

—তুমি এলে বলে এত কথা বলছি। আশী বছর তো হল, শতাব্দীর সূর্য অস্ত যাওয়া অবধি কি থাকব? মনে হয় না আমার।

—চমৎকার তো আছেন, সবল, সতেজ।

—আছি, আছি, হঠাৎ 'নেই' হয়ে যেতে চাই।

—রামলালের কথা বলুন।

—আর এখন নয়, সুরো এসেছে।

—বেলা যে একটা হল!

—একটা! না না, খেতে হয় এবার।

—উনি তো স্নানই করেন নি।

—আমি পুকুরে যাচ্ছি।

—সাঁতার জানো?

—হ্যাঁ লেকে শিখেছি। সাঁতার জানাটা কাজে দেয় খুব।

—যাও যাও।

পুকুরে সাঁতার কেটে আশ মেটে না। স্নান করে ভিজে লুঙ্গি তোয়ালে উঠোনে মেলা। তোয়ালে এসব জায়গায় অচল। গামছায় ফিরতে হবে।

সুরো বলল—শুকিয়ে যাবে।

অবশ্যই সেদ্ধ ভাত। মটরডাল বাটা সেদ্ধ, বড়ি সেদ্ধ, মানকচু সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ। আর সোমের জন্যে মোচা ঘণ্ট, মোচার কোল চাকা চাকা করে কেটে পোরে ভাজা।

সোম বলল, করেছেন কি?

—ও বেলা মাছ খাওয়াব, দেখবেন।

—হ্যাঁ সুরো, ভাল কবে খাওয়াও, তাহলে আবার আসবে।

—ভরা শীতে আসতে বলুন, তখন সব মেলে। এখন তো তেমন···

—এসো সোম। শীতে-সত্যিই··

—আসতে তো হবেই। আপনি কি ভেবেছেন, রামলালের খোঁজ আমি করব না?

—খেয়ে, পাঁচ মিনিট আমি জিরোব।

—নিশ্চয়।

—তুমিও···

—সুরো বলল, তা হবে না। মেশিন চালিয়ে আমাকে শোনাতে হবে, কেমন লাগে শুনতে।

—অ সোম! সুরোর একটা গান রেকর্ড করো তো? বলতে ভুলেই গেছি। আমাদের সুরো দিব্যি গায়।

সুরো হেসে গড়িয়ে গেল। বলল, নাতিদের গান শোনাতাম, তাতেই 'বেশ গায়!'

॥ ৭ ॥

পাঁচ মিনিটটা আধঘণ্টা ছেড়ে এক ঘণ্টা হয়ে গেল। সুরো বলল, হাঁটেন চলেন ঠিকই, কিন্তু এত কথা বলা তো অভ্যেস নেই।

—আপনি তাড়াতাড়ি কাজ সারুন তো। এই ফাঁকে আপনাব সব গানটা বেকর্ড করে নিই।

—কাজ তো শেষ।

—খাবেন না?

—আজ মঙ্গলবার। মঙ্গলবারে উপোস থাকি···সন্ধেয় মুগ ভিজানো···নারকেল···কলা···

—করে কি হয়?

—কে জানে! ছেলেদের, বউদের, নাতিদের কল্যাণে করি। ভোলা জ্যাঠার কল্যাণে করি। আমি তো জানি ও মানুষ জীয়ন্ত দেবতা।

—তবে আসুন।

—গাইতে পারব?

—নিশ্চয় পারবেন।

সুরোর বৃথা বাহানা নেই। দাওয়ায় বসে ও গাইল, পশ্চাৎ-সংগীত পাখপাখালির ডাক।

এটা কেষ্ট যাত্রার গান।

যাব না গো আর যাব না
ওদের ঘরে আর যাব না
ক্ষীর ছানা সর নবনী আমি
চুরি করে আর খাব না।

কেঁদে কেঁদে ডাকে আমায়!
তাই তো আমি খেলাতে যাই
না ডাকলে তো, অমন করে
আমি কারো ঘরে যাই না!

—আরেকটা গান,—

—এটাও কেষ্ট যাত্রার গান।

অ গোপালের মা!
কালীদহে গোপালকে যেতে দিও না।

জলে আছে কালীয় নাগা
যেমনি কানু নামবে জলে
ল্যাজ দিয়ে পাক, পাক দিয়ে ল্যাজ
ডুবিয়ে নেবে, উঠতে দেবে না!
তখন কে বাজাবে বাঁশী কদম্বমূলে?
তখন কে গো করবে খেলা
এই গোকুলে!

বাস্! এসব হল সেকেলে যাত্রার গান। এখনকার যাত্রা সব অন্যরকম।

—হ্যাঁ, সিনেমার মতো।

—আমার ছেলেরা এসব গান শুনলে হাসে। বলে মা! এখন আর এ গান চলে না।

—শুনবেন, কেমন গাইলেন?

—শুনি।

নিজের গান শুনে কি খুশি, কি খুশি। বলল, আপনি খুব ভালো লোক। আপনি একটু শোবেন না?

—না। তিনটে বাজলে ওঁকে তুলে দেব। একটু কষ্ট দেব। কাল তো চলে যাব।

—দেখবেন, উঠে যাবেন। আমি তো বলি, ওঁর ভিতরেই একটা ঘড়ি আছে। সেটাই ওঁকে সময় মতো তুলে দেয়।

ভোলানাথ ঠিক তিনটাতেই উঠলেন। অপ্রতিভ হেসে বললেন, দেবি হয়ে গেল?

—না না।

—আজ বাড়ির সামনেই হাঁটব। একটু না হাঁটলে···দাঁড়াও, মুখ হাত ধুয়ে আসি। আরে, পঙ্কজ! কি পেলি?

সুবোব ছেলে পঙ্কজ, বছব বাইশ বয়স হবে। জয়বাংলার প্যাণ্ট ও গেঞ্জি পরনে, চুলের ছাঁটেও কায়দা, কিন্তু মুখের ভাব সরল, নিবীহ। আড় মাছ।

—কেমন মাছটা দাহ? জ্বলজ্বল করছে, তাই না? বলে পনেবো টাকা কিলো। আমি বারো টাকায় আনলাম। খুব টাটকা।

—যাক, তোদেরও কদ্দিন মাছ খাওয়া হয় না।

হাত মুখ ধুয়ে ভোলানাথ বসেন।

—রামলালের কথা শেষ করেন নি।

—বুড়ো মানুষ ··বকি বেশি···একটু আগে থেকে চালাও, শুনে নিই।

শুনে নিলেন। তারপব বললেন, চালাও।

—হ্যাঁ।

—মগনাদিতে দু-তিন বছর থাকব বলেছিলাম ওকে। ও বলেছিল পরশু আসব। ঠিক এসেছে সকালে। কি কাণ্ড করেছে জানো? বিরগেড়িয়াতে আমাদের কাছে যা যা শুনেছে, তার ওপরেই গান লিখেছে পাগলা দিনভোর!

—কি কি গান ?

—একেকটার লাইন শোনো···

শুন শুন সভাজন শুন দিয়া মন
তেভাগা মঙ্গল কথা কর গো শ্রবণ !
আগে শুন আদি কথা,
নাহিলে বুঝিবে কি তা।
কেন সেথা নরনারী করে মহারণ !

এ গানটাই মস্ত বড়ো। কেমন গুছিয়ে বলেছে! সুন্দরবন কত দুর্গম, জমিদাররা জমির লাভ দেখিয়ে কেমন মানুষকে দূর দূরান্ত থেকে টেনে আনল, আর কেমনভাবে শোষণ করতে থাকল, ইত্যাদি।

—সেসব গান কোথায় ?

—আরে শোনো না, আট দশটা গান লিখে ফেলেছে এব মধ্যে! কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়ো। আমি বলি, রামলাল, করেছ কি ? ও বলছে, সুরও দিয়েছি,

—সুবও দিয়েছ ?

—নিশ্চয়। এ গান গাইতে হয় হাতে ঘুঙুর বেঁধে, তালি মেরে মেরে, ঘুরে ঘুরে। আগে আমি পিতলের ফাঁপা বালা, ভিতরে ঘুঙুর ভরা, গড়িয়েছিলাম। পুলিশ কেড়ে নেয়। ব্যাপারটা বুঝলে সোম ?

—কি বলুন তো ?

—হাতে কঙ্কণ পরে কবিগান গাইতো গায়ক তাকেই বলতো কবিকঙ্কণ। একজনের নামই বিখ্যাত। কিন্তু এমন নিশ্চয় ঐতিহ্য ছিল। তো আমি বলছি, অমন কঙ্কণ পরার কথা তোমায় বলল কে ?

ও বলল, আমি শুনেছি, দেখেওছি। সুরসুধাসাগর বনমালী বেরা গাইতেন, কনকাপুর রাজবাড়িতে। গান শুনবেন না একটু ?

'না' বললে ও বোধহয় মরেই যেত আছাড় খেয়ে। বললাম, গাও !

—গাইল ?

—নিশ্চয় ।

জোঁক যখন রক্ত শুষে
খিদার জন্য খায়
জমিদারের শোষণ কত
জোঁকের বাড়া হয় !
যশোদানন্দন কৃষ্ণ
একশত আট নাম
জমিদারের শোষণের ভাই
নয়া নতুন নাম ।
আনি-শুনি-কয়ালি দাও
দাও হিসাববালা !
মুহুরি.তহুরি দাও
নয় ! গারদে দিব তালা !
পার্বণী দাও, কাকতাড়ানি
খামারচেলানি !
দারোয়ানি-মাচাটুট
নইলে বেগার হলি !
কৃষকের রক্ত তারা শতমুখে খায়
বউ মেয়ের ধর্ম লুটে,
কহা নাহি যায় !
এতেক সহিছে তারা
তারপরে ভাই !
বুঝিছে যে যুদ্ধ ছাড়া
বাঁচবার পথ নাই !

—আপনার মনে আছে ?

—থাকার কারণ আছে। এ গানটা যখন গেয়েছিল, আমি কেঁদেছিলাম জোর !

অ শহীদের মা !
শহীদ সন্তান তব,
অশ্রু ফেলো না !

এটা বেড়মজুর, রাজবাড়ি আর ছোট আজগড়ার ছয় শহীদকে নিয়ে বাঁধা। শেষে বলছে,

কার তরে কাঁদ মা গো
কার তরে কাঁদ !
হাজার সন্তান হোথা
দেখে বুক বাঁধো
শহীদের রক্ত ধারা
ঝরাইল যারা
সেই পুলিশ পলায় নায়েব পলায়
ভাঙে কংস কারা !
হাজার কিষাণ মা গো
হয় আগুয়ান !
বহে আনে শহীদের
রক্তে বোনা ধান !
অ শহীদের মা !
হাজার সন্তান আছে,
তুমি কেন্দ না।

ব্যাপারটা ভেবে দেখ সোম ! আমাদের কাছে পুরো রাত ধরে ও শুনেছে, মনে গেঁথে নিয়েছে কথাগুলো। আমি ওর হাত ধরে বললাম, রামলাল ! ভাই ! কথা দাও।

—কি কথা ?

—এ অবধি তুমি যত গান বেঁধেছ, সব গান—তোমার সে লক্ষ্মী-বন্দনা থেকে, সব গান একটা বড় খাতায় লিখবে।

—লিখে কি হবে ?

—দিন তো একরকম থাকবে না রামলাল। দিন আসছে।

তখন তোমার লেখা সব গান বই করে ছাপাব। তোমাকে কলকাতা নিয়ে যাব। আমাদের সভায় তুমি গান গাইবে!

সোম! আমার মনের দ্বন্দ্বটাও দেখ! গণসংগীত যে গণেরই জন্য, এবং প্রকৃত গণশিল্পীই তা গাইবে,—গাইবে সে গ্রামেই—মানুষ গ্রামেই থাকে,—চাষী-ভাগচাষী-ক্ষেতমজুর উদ্বুদ্ধ হবে,—এতেই আমার বিশ্বাস। আবার কলকাতায় ওকে নেব, মঞ্চে ওঠাব, তাহলে ও স্বীকৃতি পাবে এটাতেও বিশ্বাস।

অর্থাৎ কলকাতাই সব, এমন ধারণা নিশ্চয় মনে গভীরে ছিল, নইলে ও কথা বলব কেন?

—রামলাল কি বলল?

—সে বলল, বাবু! এই গান তাদের সামনে গাইতে পারলে তবে তো হত।

—বললাম, বেশ! এ কয়টা গান আমাকে লিখে দাও, আমি নিয়ে যাব। গাওয়াতে পারি ভালো, নয় কবিতা হিসেবেই শোনাব।

ও খাতা থেকে পাতা ক'টা ছিঁড়ে ফেলল। সযত্নে ভাঁজ করে আমাকে দিয়ে দিল, বলল, নেন।

—ছিঁড়ে ফেললে? তারপর?

—ও তো আমার মনেই আছে।

তখনো মুখ তুলে কথা বলছে না। বিশাল একটা অভিমানে যেন থমথম করছে। কৃপাসিন্ধু ওর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। বলল, এটা তুই কি করলি?

—কেন?

—তারপর?

—দাদা! গান তো আমার মনে। গান আমরা ভুলি না।

'গান আমরা ভুলি না'—এ কথাটার তাৎপর্য সেদিন বুঝিনি, পরে বুঝেছি। ওরাই গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সত্যি বলতে কি শেখ গোমানি ও লম্বোদরের মত বিখ্যাত লোক, মুর্শিদাবাদে যারা আলকাপ গায়, প্রাচীন দিনে কবিগান গাইত

পাঁচালী গাইত, কে কবে খাতা দেখে গেয়েছে? রামলাল তো সেই ঐতিহ্যেরই লোক।

—আর কি কি গান বেঁধেছিল?

—ধৈর্য ধরো। আমি বললাম, খেরো খাতায় লিখবে, খাতা তুমি বুক দিয়ে রক্ষা করবে।…ও বলছে, আন্দোলন তো চলবে, কি হচ্ছে তা আমি জানব কেমন করে?

—কৃপাসিন্ধু বলল, যেতে দূর পড়ে, তবুও তোকে কাঁথিতে চন্দ্রাতপ গ্রামে আমাদের লোক চরণ নস্করের বাড়ি চিনিয়ে দেব। সেথা ঠিক খবর পাবি। তারই লোক যায় আসে, নয় তমলুকে ব্যবস্থা করে দেব!

—আমি বললাম, না। ও যেখানে আছে সেখানেই থাকুক। যে কাজ করছে, তাই করুক।

রামলাল বলল, ওই যে 'লাঙল যার জমি তার' তা কি শুধু ওখানেই হবে? আর কোথাও হবে না।

আমরা সেদিনের বিশ্বাসে বললাম, সর্বত্র হবে। তখন ও বলে, ওই গানটা গাই?

লাঙল যাহার জমি তাহার,
জমিদারের নয়!

অগত্যা বললাম গাও।

কাগজগুলো আমাদের কাছে। মন থেকেই ও হাত তালি দিয়ে ঘুরে ঘুরে গাইছে।

তারপর সব গান, বাঁধনা-করম-বাহা পরবে যা গাইবে সেসব গানও টুকে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রামলাল চলে গেল। আমিও কথা দিলাম, যে অবশ্যই ওকে খবর পৌঁছব।

কথাটা দিয়ে তো আমরা গেলাম। হাঁটা পথে কাঁথি, তারপর হলদি নদী ধরে আবাদে পৌঁছনো. এসব আর বলব না। যেয়ে আমি তো গেলাম ভূতোবাবুর কাছে। তা গান দেখে সে লোকের উত্তেজনা কি! বলে, আমিই গাইব সভায়।

আমরা বলি, সর্বনাশ হবে। মন্বন্তরের কালে কোরাসেও আপনার গলা…

—তা প্রচার তো করতে হবে।

—প্রচার হয়েছিল ?

—হ্যাঁ, ভুতো, মানে নিরঞ্জন বাবু গানগুলো অষ্টাঙ্গ বাউলকে দিল। তার নামই অষ্টাঙ্গ। গান গেয়েই ঘোরে সে। আমাদের খবরাখবর দিয়ে যায়। গান তাকে মুখস্থ করানো হল। সে বলল, কি আছে ? আমাদের সুরেই গেয়ে দেব।

গলায় জোর ছিল খুব। তখন তো আমি যে এলাকায়, সেখানে জমিদাররা নায়েবরা পালিয়ে গেছে। গলা ছেড়ে ও গাইছে 'অ শহীদের মা !'

রামলালের সুরটা কানে লেগে আছে, আবার এ গানও লাগছে ভালো। কৃষক, ক্ষেতমজুর, তারা তখন উদ্দীপিত হয়ে আছে।

তখন তো জানি না, যে এমন দিন থাকবে না। আর পবে বুঝেছি, তেভাগার প্রথম পর্যায়ে লীগ-মন্ত্রিসভা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ বিল গেজেটে ছাপে, এবং বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে তা পেশ করে পাশ করানো হবে স্থির হয়। কৃষকসভা, কিছু সমালোচনা করলেও বিলকে অভিনন্দন জানায়। এ বিল আসবে, আইন হবে, এমন ধারণা থেকেই কি বাংলার অন্যত্র তেভাগা আন্দোলন শিথিল হয়ে পড়ে ? অথবা আন্দোলন যেমন তীব্র, দমন পীড়নও তেমনই হয় ?

—সে বিল আইন হয়নি। আইন হয় অনেক বাদে। জমিদাররা যথেষ্ট সময় পায়, যাতে জমি তারা নানা প্যাঁচে ধরে রাখতে পারে।

জেনো, জঙ্গল কেটে, জমি বিক্রিও স্বাধীনতার পরে পরেই ব্যাপক শুরু হয়।

আমরা তখন কিছুই জানি না। কৃষক ফ্রন্টের কর্মীরা কাজ করতে এসেছি। সে সময়ে কাকদ্বীপ-তেভাগার আন্দোলন, ১৯৪৮ সালেই যথেষ্ট জঙ্গী হয়। তার বিশদ বর্ণনায় যাব না।

আমাদের কাগজ তখন বন্ধ। আজ এক নামে কাল এক নামে কাগজ ছাপা হয়। আমাদের হাতে পৌঁছায়ও কম। তবু আমি কথা রেখেছিলাম খানিক। মেডিকেল কলেজের এক কর্মী, খড়্গপুরে তার বাড়ি, হাড়োয়া থানায় তাকে পাঠাল পার্টি। তার হাত ধরে বললাম, এ কাগজগুলো রামলালকে দিতে হবে। কষ্ট তোমার হবে। তবু যদি কোনোভাবে নারাণগড়ের পাশে মগনাদি গ্রামে কৃপাসিন্ধুর ঘরে পৌঁছে দাও. ও পেয়ে যাবে।

পেয়েছিল ?

—পেয়েছিল। তা জেনেছি অনেক পরে। কেন না দীর্ঘদিন তার সঙ্গে যোগ রাখতে পারিনি। আর নয়, সুরো চা আনছে।

চা, সাঁৎলানো মুড়ি। সাঁৎলানো মুড়ি যে এত ভালো লাগে, তা সোম জানত না। ভোলানাথের বেলের মোরব্বা।

—চলো, হেঁটে আসি।

—না হাঁটলে আপনার অস্বস্তি হয়।

—বাবা উকিল ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভাবগতিক দেখে সোদপুরে অনেকটা জমি কেনেন। তখন শস্তা ছিল। ওরা তো সেই জমি আজকের দামে বিক্রি করেছে, কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনেছে সেই কবে। এ বাড়ি আমারই। আমিও লিখে পড়ে সুরোকে দিয়েছি। শর্ত, বেচবে না, বাস করবে, এবং গাঁছ কাটবে না।

—গ্রাম আন্দাজে অনেক সম্পত্তি।

—হবে! ওর নামে থাকাই ভালো, ছেলেরা তোয়াজ করবে। পঞ্চায়েত বলে, সামনের ঘরটা ছেলেদের ক্লাবকে দিলে, পারতেন। আপনার নাম থাকত। আমি বললাম, নাম রেখে যাবার কোনো বাসনা আমার নেই। বিনোদ ডাক্তারকে দেখে আমাব খুব শিক্ষা হয়েছে। পারলে ওর বাড়িতে ওর নামে শিশু কল্যাণ কেন্দ্র করতে ?

—কোথায় ?

—দধিমঙ্গলে। খুব পশার ছিল, নিঃসন্তান। সব পেল বোনের ছেলেরা। তাদের আড়ত রানাঘাট, দত্ত ফুলিয়ায়, তেলা মাথায় তেল

পড়ল। বিনোদ ডাক্তার বারবার বলেছিল গ্রামে এমন পাকা বাড়ি, তোরা তো থাকবি না, মামা মামীর নামে একটা শিশু কল্যাণ কেন্দ্র করে দিস।

—করেনি ?

—করে কখনো ? তারা বাড়িটাকে সার, বীজ, পোকামারা ওষুধ, এ সবের আড়ত করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে ওঁরা কিন্তু নদীর ধারেই চলে যান।

—ইচ্ছা মতো বেঁকে বেঁকে চলে তাই বুঝি নাম ইছামতী। তবে জীবনীশক্তি আছে। কত নদী মরে গেছে, ইছামতী ঠিক আছে। আবাদ অঞ্চলেও নদী খালের অন্ত নেই। ভাটার সময়ে পাঁক কি রকম।

—বনের দিকে গেছেন ?

—আমি যাই নি। বনের কাছাকাছি গ্রামে অন্যেরা গেছে। বনেব কাছে থাকতে বুকের পাটা লাগে।

—বাঘ ?

—বাঘ, কুমিব, কামট, সাপ, কি চাও ?

—কারা থাকত ?

—ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতালও দেখেছি। আর দেখেছি মেদিনীপুর ও ওড়িশার লোক। জমি পাব, এই স্বপ্নেই তো ভূমিহীন মানুষ চিরকাল দেশান্তরী হয়।

—তখন অগম্য ছিল ?

—বন তো কাটা পড়েছে। যা আছে তাতে মধু আনতে, কাঠ পাতা আনতে যাদের যেতে হয়, নিশ্চয় যায়। সেদিন, যেসব জায়গায় তেভাগা হয়, তা প্রায় অগম্য ছিল। একটা জিনিস দেখাই।

—কি ?

—ওই যে বড় তেঁতুল গাছটা, ওর গায়ে গর্তটা দেখেছ ? দেখে রাখো। একজোড়া কাঠঠোকরা, কয়েক বছর ধরে অদম্য জেদে

ঠুকে ঠুকে গর্তটা করল। ওদের চেষ্টাটা দেখলাম। আরেকটা মহান দ্রষ্টব্য আছে, চলো দেখাই।

পরমোৎসাহে হাঁটতে থাকেন উনি। হাঁটার সময়ে পায়ে বাদামী কেডস।

—হাঁটার জন্যে কেড্‌স···

—হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, মানে রাম সেনকেও কিনে দিলাম। ওই জুতোই ওঁর পছন্দ।

—ওকে তুমি সাহায্য করো, তাই না?

—এই যা সামান্য · তাও তো ··আসলে উনি এমনভাবে দাবী করেন, সামান্য জিনিস···হোমিওপ্যাথি ওষুধ···কখনো গেঞ্জি··· বড়জোর একজোড়া জুতো···আমার খুব ভালো লাগে। আপনজন মনে করেন বলেই তো···

—পেনশান পায়?

—তা পান। খুব টানাটানিতে চলে। ছোট একটা দোকান দিয়েছেন কলোনিতে। ঘাড়ে বিধবা ভাইঝি, তাঁর তিন মেয়ে। তবে খুব মনের জোর। বলেন, বিয়ে দিতে পারব না। মুরগি পালন, সেলাই, তাঁত—তিনজনকে তিনটে ট্রেনিঙে দিয়েছেন।

—নিজে সংসার করল না, অথচ সংসার ওকে ছাড়ল না।

—খুব আনন্দ করে বাঁচেন। উনিই তো আমাকে এ কাজে··· রীতিমতো ধমক দিয়ে···

—এই যে, দেখ!

গ্রাম সীমান্তে একটি শিমুল গাছ গোড়া উপড়ে পড়ে আছে, অথচ গাছটি মরে নি। সামনে একটি চালাঘর। তাতে কোনো মূর্তি আছে। একটি সাধু।

—শিমুল কাঠ, দামী কাঠ। ঝড়ে যখন উপড়ে পড়ল, তখন তো ওটাকে কাটব, বেচব বলে সবাই অস্থির। আমি বললাম, তার চেয়ে ওকে দাঁড় করাও।

—কি করে?

—সেই জন্যেই তো হল না। ক্রেন ছাড়া এ কাজ হয়? কিন্তু কয়েকটা শিকড়ের জোরেই গাছটা বেঁচে থাকল। কি বাঁচার চেষ্টা তাই বলো।

—ওই মন্দিরে?

—ভাগ্যক্রমে ওই সাধু তার এতটুকু কালীপ্রতিমা নিয়ে এসেছিল আশাবাড়ির হাটে। ওকে নিয়ে এসে এখানে বসালাম। গাছটা কারো জমিতে নয়, এই যা রক্ষে। তা ও বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। গাছটা কাটার কথাও আর কেউ বলে না।

—ফুল ফোটে?

—খুব। গাছটার বেঁচে থাকাটা দেখ। ঠিক আমাদের দেশেব গরিব মানুষের মতো।

—চলুন ফেরা যাক।

ঘরে এসে গুছিয়ে বসতে বসতে সাতটা বাজে।

—আপনি কাকদ্বীপ থেকে এলেন কবে?

—ধরপাকড় জোরজুলুম···আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছতে যখন বোঝা গেল, আর টানা যাবে না···তখন কংসারি হালদাব, অশোক বোসের মতো নেতারাই···আমাদের সরিয়ে দিতে থাকলেন। চলে যাও, ক্ষয়ক্ষতি যা হবার তা হয়েছে···যতটা কম হয়।

—কোথায় গেলেন?

—প্রথমে ঢাকা···তারপর চট্টগ্রাম···আবার কলকাতা···তারপর দেওঘর · বুঝি ১৯৫২ সালে। ক্যানিং থানার কুমারশা গ্রামের সম্মেলনের পর আমি আবার মেদিনীপুরে ফিরে এলাম। আমার পুরনো জায়গা।

—ওর খোঁজ করলেন না?

—করলাম না? কৃপাসিন্ধুর বাড়ি আগে গেলাম। ও তখনি বেশ অসুস্থ। সম্মেলনেও যেতে পারেনি। তারপর একদিন জিরিয়ে বিরগেড়িয়া। আমাকে দেখে শুক্রার মা প্রথমে হেসে ফেলল, তারপরই কেঁদে ফেলল।

—কোথা তোমরা ছিলে বাবু! জমিদারে মহাজনে জীবন ছারখার করে দিল। ভাগে চাষ করতে দেবে না, মহাজনের কাছে ধার, তাতে এত এত সুদ চায়!

—কবে থেকে বাড়াবাড়িটা হল?

—ওই গান থেকে! হাটে যেয়ে সে লোক তোমাদের কথা নিয়ে গান করল, সেই থেকে!

—সে কোথায়?

—আমাদের জন্যে ছুটোছুটি করে। আজ বুঝি ঘরে আছে। চল, দেখাই ঘর।

সেই নালার ধারে ঘর একটি। আমি ডাকতে ও ছুটে বেরিয়ে এল, আর আমার হাত ধরে এই হাসে, এই কাঁদে, ওকে সামলানো দায়।

ঘরে যেয়ে বসলাম। বলে, এখান থেকেও চলে যেতে হবে। আমার জন্যে ওদের ওপর খুব…কিন্তু বাবু! গান অনেক, সে অনেক! সে খাতাটা আমি হাতছাড়া করিনি।

ঘরটি বড়ই। শয়ন কাঠের মাচানে। খেজুর পাতার বোনা মাদুর পাতা। ঘরের দাওয়ায় রান্নার ব্যবস্থা।

শুক্রার মা বলল, একটা বিয়ে করতে বলুন দেখি! কোনদিন রাঁধে, কোনদিন রাঁধে না।

আমিও বললাম, রামলাল! এভাবে সন্নেসী হয়ে থাকলে…বিয়ে করো। চেহারাও খুব ভেঙেছে।

শুক্রার মা বলল, ওই গানের জন্যে কাছারিতে নিয়ে খুব লাঞ্ছনা করল। তা বাদে থানাতেও নিয়েছিল। শেষে ভব মাইতি ওকে ছাড়াল। সেই বলেছে, তখন জেল খেটেছ, সবই জানে। জমিদারকে বলে কিছু জমি বন্দোবস্ত করে দিই, থাকো।

—রামলাল, রাজী হয়ে যাও।

—আপনিও এ কথা বলছেন?

—এসব রুক্ষ, অফলা জমি, অবশ্য…

—সে তো শুক্রারা আবাদী করে দেবে বলেছে।

—তবে নাও।

—আমার গানের কারণে এদের উপর…

—তোমার গান একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু এখন এটা জমিদারের নীতি।

—তাই হবে। তাই জঙ্গল কাটতে লেগেছে, জমি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে।

—হ্যাঁ, জঙ্গল যেন পাতলা দেখলাম।

শুক্রার মা বলল, বন গেল, তো লোধারা গেল, আমরাও যাব বাবু।

রামলাল বলল, আজ থাকবেন তো ?

থাকলাম। ও বলল, এরাও ছাড়তে চায় না, আমারও মন চায় না, বয়সও তো হল বাবু!

—গান করো তো ?

ও সব গান হাটে বাজারে মেলায় আর গাই না। অন্য গান গাই। তা বাবু, ও গান আপনি নিয়ে যান।

—এদের পালাপরবে গান গাইছ ?

—গাই, খুব গাই। ওরা বললে যত না বোঝে, গান গেয়ে বললে সব বোঝে। বাহা পরবে আসবেন। শাল ফুলের পরবে। তখন শুনবেন।

—তোমার চলছে কি করে ?

—গান গাইলে কিছু হয়…ওরা তো আছেই।

আমি বললাম, ভব মাইতি যা বলছেন শোনো। তোমাকেও তো বাঁচতে হবে। তুমি মরে গেলে গান কে গাইবে ? তা ও বলে, জমির জন্যে এত ! আমি জমি দেব !

—নাও রামলাল ! আদিবাসীরা জমি ধরে রাখতে পারবে না, কৌশলে ছলেবলে অন্যরা ওদের উৎখাত করবে। তুমিই নাও। প্রথমত ওদেরটা নিচ্ছ না। তারপর, চাষবাস ওরাই করবে, তোমাকে আধা দেবে।

ও বলল, না, তেভাগা! এক ভাগ আমার, দু'ভাগ ওদের কেউ না জানুক, এখানেই তেভাগা হোক।

আমি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। ও বলেছিল, এক শর্তে। আমার গানের খাতা আপনি নিন।

—রামলাল! তোমার ওই কয়টা গান, কাকদ্বীপে বাউল, বাউল সুরে গেয়েছে, জান?

ওর চোখ যেন কেমন হয়ে গেল। যেন কতদূর থেকে ও আশ্চর্য হেসে বলল, মানুষ নেয় নি?

—নিয়েছে রামলাল, নিয়েছে। তুমি জানো না কিভাবে ওরা নিয়েছে।

—বাবু! অহল্যা···বাতাসী···উত্তমী···ওরা শুনেছিল? আমার গান?

আমি এর উত্তর জানি না, তবু বললাম, সবাই শুনেছিল। ও মাথা নাড়তে থাকল, এই তো ঠিক! এ আমি মস্ত পাওনা পেলাম! বাউলের সুরে! তাই হোক! যে যেমন সুরে হোক গান করুক না কেন! তাই হোক! তারপর বলল,

অহল্যা মাতা! উত্তমী মা গো!
চন্দনপিড়ি ধন্য!
কত সাথী লয়ে প্রাণ দিলে মা গো!
ধরায় আনিলে পুণ্য!

এ গানটা গাইতাম বলেই···বাবু! আপনি যা বলেছেন তাই হোক! তেভাগা তো হল না বাবু! দিনে দিনে···দিনে দিনে··· দেখবেন, সব বদলে যাবে···সব!

—ভাল হবে, কি মন্দ হবে?

—ভাল কি আর হবে বাবু? চালের দাম নামবে না, মানুষের দাম থাকবে না। এ যেন আমি মনে জানছি। পটুয়ারা যেমন পট খুলে, তেমনি কে যেন পট খুলে দেখাচ্ছে আমাকে।

আমরাও তা জানি। সে জন্যেই লড়তে হবে। লড়াই তো থামালে চলে না।

—না বাবু, তা চলে না

—মন স্থির করো রামলাল। থিতু হও। পরবর্তী সম্মেলনে তোমাকে যেন নিয়ে যেতে পারি।

পরে জেনেছি, ওই তেভাগা করতে রামলালের কত কষ্ট হয়েছিল। ভব মাইতির চেষ্টায় জমি তো হল পাঁচ বিঘা। শুক্রাদের সে জমি হাসিল করতে, চাষ করতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ওদের সমাজের সবাই বলছে, তোমার এক ভাগ, আমাদের দু'ভাগ? না, সেটা অধর্ম হয়ে যায়।

জানতে পেরে আবার ছুটি। শুক্রাদের বোঝাই। গম্ভীর সিং সমাজের মাথা তাকে বলি, ওর তো কিছুই নেই। হালবদল থেকে তোমরাই সব দিয়ে থুয়ে চাষ করবে। সে কারণেই তোমাদের দু'ভাগ, ওর এক ভাগ। এতে রাজী না হলে ও জমি রাখবে না।

রামলাল বলল, শুক্রা! ভাই! আমরা যাই নি, কিন্তু তেভাগার জন্যে সবাই কত কষ্ট করল, তাতেও হল না, তা এখানে আমরা তেভাগা করি না কেন? বাবুরা দেখুক, যে এক ঠাঁয়ে হয়েছে।

—হয়েছিল?

—হয়েছিল। কিন্তু এর পরিণাম বহুদূর গড়ায়, বহুদূর। রামলাল যদি দেয়, অন্যেরা দেবে না কেন? অনেক অশান্তি, অনেক। জমিদাররা ব্যাপক বর্গা-উচ্ছেদ করতে থাকে।

—রামলালকে সম্মেলনে নিয়েছিলেন।

—না সোম। নিই নি। বলেছিলাম যখন, তখন আন্তরিকতা ছিল। তারপর কলকাতায় এসে কত দেখালাম, কত বললাম, আগ্রহী করতে পারি না কাউকে।

আর কি জানো। ওখানেই আছি যত বড় জেলা হোক, একই জেলায়! কিন্তু আর তো যেতে পারি নি ওর কাছে। এ ভাবেই কয়েক বছর! তারপর খাদ্য আন্দোলন! জানো কিছু সে কথা?

—শুনেছি।

—কলকাতার পথে আমরা কৃষকদের টেনে আনলাম, পুরুষ ও মেয়ে। সবাই শহরের পথও চেনে না। তারপর পুলিশের গুলি! গুলির জন্য তো প্রস্তুত ছিল না কেউ। শহরের পথও জানে না, পালাবে কোথায়? খবরে বলে আশী জন নিহত। আশী হোক, আশী লক্ষ হোক, আমি যাদেব আনি, তাদের মধ্যে বেঙাও ছিল। বেঙি বলেছিল, তুমি বলে ওকে যেতে দিচ্ছি। আজকাল চলতে পারে না।

বেঙা আমার সামনেই মরে। আমিও···লাঠি খেয়ে···হাসপাতাল ···মাথায় লাঠি···নানা কারণেই আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম যেন।

আমার জেল হল। অবশ্য বেশিদিন নয়। কিন্তু কৃষক আন্দোলনে আমরা যথার্থ ভূমিকা পালন কবতে পেরেছি কিনা···ভাগচাষীদের কথা যত ভেবেছি · ক্ষেতমজুরদেব কথা তত ভেবেছি কিনা···আমার নিজের মধ্যেই বহু প্রশ্ন এসে গিয়েছিল! আর রামলালের গান?

কলকাতায় সংস্কৃতি ফ্রণ্টে তখন অন্য হাওয়া···ওই খেরো খাতা সেখানে ঠাঁই পেল না ··মনে হল, আমি পার্টির ভেতরে থেকে কিছু করতে পারব না···আজকের ভাষায় 'বিক্ষুব্ধ' হয়ে গেলাম···

জেল থেকে হাসপাতাল। যক্ষ্মা ধরে গিয়েছিল।' বছরখানেক যাদবপুরে। তারপর সব ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। শুনলাম আমি পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন।

তাই হবে সোম, তাই হবে। একটা মানুষের মধ্যে কত মানুষ বাস করে, তাও কি সব সময়ে বুঝি? বঙ্গভঙ্গের বছরে জন্ম। কংগ্রেসে গেছি, অসহযোগ আন্দোলন করেছি, সন্ত্রাসবাদ·· বার বার জেল খেটেছি···তারপর কম্যুনিস্ট মতে উত্তরণ···নিজেই নিজেকে বোঝালাম, ভোলানাথ! যথেষ্ট হয়েছে। এবার সরে যাও।

—চলে এলেন?

—হ্যাঁ।

—রামলালের সঙ্গে?

—দেখা করিনি। সেই পটুয়ারা···রামলাল···কার কাছে কোন্ কথা রাখতে পারলাম ?

—খাতাটা ?

—হ্যাঁ। খাতাটা দশ বছর আগে, বনগাঁর প্রেস থেকে গণকবিয়াল খাটুয়ার 'সংগীত সংগ্রহ' নিজে খরচ করে ছাপালাম। ওটাই তোমাকে দেবার মত চমক আমার।

—বই আছে ?

—আছে, আছে সোম। ওকে পাঠিয়েছিলাম, জানলাম না পেল কিনা। তুশো ছাপিয়েছিলাম, উই লেগে সব ভুষ্টিনাশ। কয়েকটা কপি বড় যত্নে রক্ষা করেছে, সুরোকে বলেছি, আমার চিতায় দিয়ে দিও। এই আমার যক্ষের ধন।

—আমাকে···

—দেব, নিশ্চয়ই দেব। দিয়ে আমি ভারমুক্ত। তুমি যদি যাও···

—যাব, নিশ্চয় যাব।

—তু'খানা নাও। একটি তাকে দেবে। একটি তোমার।

কাঠের সিন্দুকে আলকাতরা মাখানো। তার মধ্যে নিমকাঠের বাকস। সেই বাক্সে তামাকপাতা জড়ানো বই।

বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়'-এর মতো পাতলা কাগজের মলাট, বাদামী কাগজে ছাপা একশো পাতার বই। মুদ্রক, প্রকাশক, ভোলানাথ দত্ত। দাম লেখা নেই।

—কলকাতায় কাউকে দেন নি ?

—কেন দেব? কলকাতা আমাকে ভুলে গেছে, আমিও কলকাতাকে ভুলে আছি। বড় অস্থিরতা নিয়ে এখানে এসেছিলাম হে! সে জন্যেই, নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যেও গাছপাগল ভোলানাথ হয়ে গেলাম।

সোম বই তুটি নেয়।

সুরো রাত কত হল ?

—আমি তো তৈরি।

—চলো সোম ! হাতে মুখে জল দাও। আজ তো তোমার মাছ খাবার দিন।

গরম ভাত, বড়ি ও বেগুন দিয়ে আড় মাছের ঝোল, আলুর তরকারি, ঘন দুধ।

ভোলানাথ বলেন, আজ এতকাল পরে, যেন নিশ্চিন্ত বোধ হচ্ছে।

সোম কথা বলে না। সে খুব বিচলিত, খুব অভিভূত। আসবে সে আবার আসবে। ভুলে যাবে না।

আজ রাতে ওর ঘুম আসে না।

রাত পোহালে যখন ও তৈরি হয়, ওঁকে প্রণাম করে, উনি ওর মাথায় হাত রাখেন।

সুরো, সবোজ ও পঙ্কজ বলে, আবার আসবেন। এই দুটো দিন যেন বাড়ি ভরে ছিলেন।

ভোলানাথ ইছামতীর পাড় অবধি আসেন। হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকেন। গেরুয়া পরা শান্ত চেহারা। মাঝি লগি ঠেলতে ঠেলতে বলে, অহন যে অত গাছ দেখলেন ভিতরগাছিতে, হকলডি বুড়া কর্তার তাড়নে লাগাইছে। খুব নিবৃক্ষ হইয়া ছিল গরামডা।

যাক, গাছরা ওঁর সঙ্গে কোনো দু'রকম আচরণ করবে না। ওরা মানুষ নয়, কৌশল জানে না।

সব জায়গায় গাছ থাকে কখনো, তারপর নির্বৃক্ষ হয়ে যায়, তারপর একজন ভোলানাথ দত্ত আসেন, আবার গাছ দেখা যায়। হয়তো আবার নির্বৃক্ষ হবে একদিন, হয়তো আবার আরেকজন ভোলানাথ আসবেন, এই রকমই চলতে থাকবে, যতদিন না মানুষ বোঝে, যে গাছগুলি লাগানো হয়, তাদের লালন পালন করা ততদিন দরকার, যতদিন না তারা মাটির গভীরে শিকড় চালিয়ে নিজেরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখে।

সোম বোঝে, সে নিয়ে যাচ্ছে অনেক, আবার নিজেরও অনেকটা হয়তো রেখে যাচ্ছে।

॥ ৮ ॥

ভিতরগাছি থেকে কলকাতায় ফিরতে না ফিরতে কলকাতা সোমকে খেয়ে ফেলে যেন। কি খাব তা ভাবতে হয়, বাড়ির কথা ভাবতে হয়। শৈশব থেকে মা আগলে রাখতেন। বিয়ের পর জয়ির ফ্ল্যাটে ছিল। জয়ি দু'জন লোক রেখে দিয়েছিল। কি রান্না হবে, কি বাজার হবে, সে সব ভাবত না জয়ি। কিন্তু মাসের গোড়ায় সংসার খরচের টাকা হিসেব করত। তেল বেশি খরচ হল কেন, সে হিসেব নিত।

সোম অবাক হয়ে ভাবত, জয়ি এত হিসেবী হল কেমন করে। জয়ি বলত, হিসেব করব না? বেহিসেবী হওয়ার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই সোম। জীবন হল ডিসিপ্লিন।

তারপরে তো জয়িও থাকল না। সোমকে স্বাবলম্বী হতে শিখতে হল। খুব তাড়াতাড়ি শেখা যায় সব। সোম নিজেও ভাবেনি সে এমন আত্মনির্ভর হবে।

কলকাতা পৌঁছে পাঁউরুটি আর জেলি কিনে ওপরে উঠল। ভোলানাথ অনেকগুলো কলা দিয়েছেন সঙ্গে, গাছের ফল। সুরো মোয়া দিতে চেয়েছিল, সোম নেয়নি।

ঘরের দরজার গায়ে চিঠি দেবার জন্যে এক চিলতে কাটা আছে। দরজা খুলতেই সোম দেখল অনেক ডাক জমেছে। সহসা মনে হল, রাম সেন ছাড়া এমন লোক নেই সংসারে, যে সোমের কুশল জানতে চায়, বিজয়ার পর আশীর্বাদ জানায়।

বাবার ছবিগুলো মার সুটকেস থেকে বের করে রাখবে সোম।

ঘরে ধুলো জমে গেছে। আগে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে হীটার জ্বেলে কফি বানাল সোম। রুটি, জেলি, দুটো কলা খেল। তারপর ঝাঁটা ধরল।

সব ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করতে দেড় ঘণ্টা গেল। তারপর

জামাকাপড় কেচে স্নান সেরে তবে ভালো লাগল খানিক। এবার ডাক নিয়ে বসা যায়।

খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা, সন্তোষী মায়ের নামে একশো আটটা চিঠি লেখার নির্দেশ, পাড়ার টি. ভি. দোকানের উদ্বোধনে আমন্ত্রণ, বিঃ দ্রঃ স্থানীয় পৌরসদস্য আসিবেন। লোকটার বয়স তিরিশ, সব দাঁত বাঁধানো, আশ্চর্য বটে।

পরভীন মালহোত্রা এক বিশাল দামী খামে, বিশাল দামী কাগজে চিঠি লিখেছে।

"তোমার কাজ কেমন এগোচ্ছে মাসে মাসে জানাবার কথা ছিল। যে বিষয়টি তুমি নির্বাচন করেছ, সেটি খুবই ভালো। লোকসংগীতে রাজনীতির প্রভাব কিভাবে পড়েছিল, কতটা পড়েছিল, তা জানা খুব দরকার। প্রথম বছরের টাকাটা যে পাঠাব, তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর সত্বর জানাও। কাজ খানিকটা এগোলে দিল্লী এলে আমরা বিশদ আলোচনা করতে পারি।"

সোম চিঠিটা সরিয়ে রাখল। গো-ফর-ট্রুথ যা চায়, তা করতে পারবে কিনা, সোমের সংশয় হচ্ছে। ভোলানাথ, রাম সেন, সুরো, আসলাম, বেঙা বেঙি, এঁদের খবর দামী কাগজে ছেপে বিদেশে প্রচার করলে লাভবান কে হবে? এ রকম গবেষণা করানো তো বৃহত্তর কোনো বন্দোবস্তীর অঙ্গ। এখন এ চিঠির উত্তর দেবার কোনো দরকার নেই।

সাংবাদিক সত্যেন নিশ্চয় প্রচণ্ড মাতাল হয়ে কয়েকবার ঘুরে গেছে। বেশ কয়েকটা ছোট ছোট কাগজের টুকরো পড়ে আছে।

—এখন থেকে ঘরের একটা চাবি আমাকে দিয়ে যেও।

—কলকাতায় কোনো লোকের এ ভাবে ফ্ল্যাট বন্ধ করে রেখে যাবার অধিকার নেই।

—বন্ধুকে যে বিশ্বাস করে না সে একটি হারামী।

—ভবিষ্যতে দেখে নেব।

আশ্চর্য মানুষ তো! যখন তখন মাতাল হয়ে এসেছে, থাকতে

দিয়েছি। মদ খেয়ে বাড়ি গেলে তোমার বউ চেঁচায় বলে তুমি এখানে থাকো। তার মানে কি এই, যে তুমি আসতেই থাকবে, আমি তোমাকে জায়গা দিয়েই চলব? আমার এ সব ভালো লাগছে না সত্যেন। তোমার মতো বন্ধু দিয়ে আমার দরকারও নেই। আমার বাড়িতে রাত কাটাও। জয়ির কাছে টাকা ধার করো। তোমার বউ ঠিকই বলেছিল, আপনারা জায়গা দেন কেন? মদ খেয়ে থাকার জায়গা পায় বলেই ও মদ খায়।

সত্যেনের বউ ওকে ভালেবাসে। এখানো সত্যেন ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে। সত্যেনের দাড়ি কামিয়ে দেয়। সত্যেনের বিবাহিত জীবনটা বন্দোবস্তী?

রাম সেনের ছুটো চিঠি এসেছে। একটি পোস্ট কার্ডে। এ চিঠিটি বেশ সংক্ষিপ্ত। নিশ্চয় মন বিচলিত ছিল। নইলে রাম সেন তো ছোট ছোট হরফে পোস্টকার্ড জুড়ে চিঠি লেখেন।

"পরম কল্যাণবরেষু, জুতা ভাল হইয়াছে। গেন্‌জি খুব দামী মনে হইল। শস্তার দ্রব্য কিনিলেই পারিতে। তোমার পয়সা কি বর্জুয়ার পয়সা? দীপালি তাঁত শিক্ষা সমাপ্ত করিল। উক্ত স্থানেই কাজ করিতেছে। বৎসর খানেক বাদে তাঁত শিক্ষিকা হইবে। মিতালিকে লইয়া চিন্তায় পড়িয়াছি। কি করিব, বুঝিতে পারিতেছি না, অথচ সমস্যা যাহা, তা পোস্টকার্ডে লিখা যায় না। বিতং জানাতেছি। আশীর্বাদ জানিবা, ইতি নিত্যাশীর্বাদক রামচন্দ্র সেন।"

নিত্যই উনি আশীর্বাদ করেন, সোম জানে। রাম সেনকে ও খুব ভালবাসে, উনিও বাসেন। সহসা মনে হয়, উনি বড় একলা, বড় অসহায়। সোমকে উনি ভালবাসেন, বন্ধু পুত্রের মতো নয়, নিজের ছেলের মতো। জয়ির সঙ্গে বিচ্ছেদটা ওঁর মনে একটা দুঃখ হয়ে লেগে আছে।

রাম সেন ইনল্যাণ্ডে চিঠিও লিখেছেন।

"ইতোপূর্বে পত্র পাইয়া চিন্তিত হইয়া থাকিবে। ওই পত্র ডাকে দিবার পরেই সকল সংবাদ জানা গেল। শ্রীমতী মুরগি পালন

শিখিবার নাম করিয়া অন্যত্র যাইত। সহসা নিরুদ্দেশ হওনে আমরা খুব বিপাকে পড়ি। কোলোনি জায়গা, দুর্নাম সত্বর রটে। যাহা হউক,—জনৈক মোটর মেরামতি গেরেজ মালিক ও শ্রীমতী বিবাহ করিয়াছে। শ্রীমান স্বজাতি নহে, বয়স জেয়াদা, বিপত্নীক। পুত্র কন্যা চারটি বিবাহ করিয়া সংসারী করিতেছে। শ্রীমান বসতবাটি ও গেরেজ পুত্রকন্যাদের লিখিয়া দিয়াছে এবং ভাকুড়িতে একতল গৃহ কিনিয়া মিতালিকে লেখিয়া দিয়াছে ও সেখানে বসবাস করিতেছে।

আজ শাঁখা সিঁদুর পরিয়া স্বামী লইয়া প্রণাম করিয়া গেল। শ্রীমানের কথাবার্তা ভালো। প্রতিবেশীরা বলিল, সে মানুষও ভালো, সকলের চিনাজানা। কাল সামাজিক নিমন্ত্রণ আয়োজন করিয়াছে। দীপালি মনঃক্ষুণ্ণ। আমি বলিলাম, ইহা বয়সের ধর্ম, যুগের ধর্ম, তুমিও মিতালিকে আশীর্বাদ করো। আমি তো ব্যয়পূর্বক বিবাহ দিতে পারিতাম না। আশীর্বাদ লইবা। ইতি নিত্যাশীর্বাদক রামচন্দ্র সেন।

পুঃ,—জানালার কাচ মেরামত করাইবা।”

যাক, রাম সেনের ঘাড় থেকে একটা বোঝা নামল। উনি চাইতেন ওরা স্বাবলম্বী হোক। ওদের বাসনা সংসার করবার। খুবই স্বাভাবিক। দীপালি ও মিতালিকে একবার এনেছিলেন উনি। সোম বাজার করেছিল, ওরা রান্না করেছিল। দীপালি বলেছিল, একবার যেয়েন দাদা, অবশ্য যেয়েন।

ওরা পাশের বাড়ি টি. ভি. দেখেছিল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখেছিল, খুব খুশি হয়েছিল। রাম সেনকে চিঠি তো লিখতেই হবে, “লেঠেল রাম” বলে কথা! অনেক বড় চিঠি লিখবে সোম। এখন ওর দরকার রাম সেনকে, ভোলানাথকে। সোমের বাবা আন্দোলন করতে গিয়েই মারা যান। বেঁচে থাকলে ওঁদের বয়সী মানুষই হতেন। মা তো বাবাকে পেয়েও পান নি। তাই সোমকেও বাবার কথা বলতেন না। সোম রামলাল খাটুয়াকে খুঁজতে নেমে নিজেকেও যেন খুঁজে পাচ্ছে।

কুণাল চিঠি লিখেছে। এটা একটা অবাক কাণ্ড। কুণাল তো চিঠি লেখে না।

"আমার মামাকে খুঁজে পেলে কি না জানতে ইচ্ছে করছে। ওঁর সঙ্গে তো দীর্ঘকাল কারো দেখা হয় না। (সোম ভাবল, দেখা হবে কেমন করে? কে দাঁড়াবে সেই বিশাল গাছের সামনে মাথা যার আকাশে ঠেকেছে?) তোমার জেদ আছে, সোম। যাক্, কাজের কথাটা বলি। শনিবার রাতে আমার এখানে খাবে। তুমি বাসমোতি চালটা এনো।"

ভিতরগাছি কি সোমের ভিতরে হাত রেখেছে? কতবার গেছে কুণালের বাড়ি। ও বাড়িতে খাওয়া মানে কেউ মাংস কেনে, কেউ ডাল, কেউ চাল। রান্নায় সবাই হাত লাগায়। নীলার সেদিন ছুটি। বাঁধে সবাই, খায় সবাই, বাসন ধোয় সবাই। মদ ও বাড়িতে চলে না। কুণাল নীলার ছেলেমেয়ের সামনে ও সব পছন্দ করে না। একই বন্ধুদল আসে, একরকম কথাই হয়।

ক্যাসেটে গজল গান হয়।

এখন সে কথা ভাবতেও ক্লান্ত লাগছে। সোম বুঝতে পারছে নিজেকে ও যথেষ্ট বাজে খরচ করেছে। এখন হিসেবী হতে হবে। যেমন সাহচর্যে গেলে, যেমন কথা শুনলে একটা প্রাপ্তির বোধ আসে, তার সামান্য সন্ধান তো পেয়েছে ও। একটা গাছবুড়ো গাছ লাগাচ্ছে আর বাঁচাচ্ছে, তা তো দেখে এসেছে। কাজের মানুষ দেখলে কথার মানুষদের আর ভালো লাগে না। কুণাল একদা রাজনীতি করেছে, সোম করে নি। সোমের মনে সে জন্যে একটা অসম্পূর্ণতার শূন্যতা ছিল। সে জন্যেই কুণালের ডাকে ও বার বার গেছে। কিন্তু কথা আর কথা যে আর ভালো লাগছে না।

সোম এখন শিকড় সন্ধানে ব্যস্ত।

তবে কুণালকে এত কথা বলা যাবে না।

দরজায় তালা দিয়ে নেমে গিয়ে দোকান থেকে টেলিফোন করে "যাব না" বলতে কুণাল কিন্তু চটে ওঠে। নীলার সঙ্গে সম্পর্কটা

কোথাও পৌঁছচ্ছে না। বয়স হয়ে যাচ্ছে, নানা কারণেই কুণাল আজকাল বেশ রেগে ওঠে।

—আসবে না বললেই হল? অভিরূপের আরেকটা বই বেরিয়েছে, অভিরূপ আমাদের অপরূপের ভাই। আমাদের একটা কর্তব্য বলে জিনিস নেই?

—অপরূপ রাজনীতি করত। বহু বছর আগে সে নিহত। তার মৃত্যুর সময়ে অভিরূপের বয়স দশ। আজ বড় বিজ্ঞাপন আপিসে সে আর্টিস্ট। ভালো রোজগার করে। তার কবিতা কেউ পড়ে না, অথচ তার বই বেরোলেই···

—এ বই হিট হবে।

—হোক না। নাম কি?

—সংশয়ের নৌকায় একগুচ্ছ জিরাফ।

—না ভাই, পারব না। তোমার কথায় অভিরূপের বই পাঁচটা কিনতে পারব না।

—কেন? কিনতেই পারবে না?

—না। ওর প্রথম বই "পতাকার হ্লাদিনী সংলাপ", দ্বিতীয় বই, "বিদ্রোহী রোমকূপ ও আত্মহত্যা" আমি কিনেছিলাম, বেচতে পারি নি। কুণাল! ও কবি নয়, আমার মতো গোলা পাঠকদের কবি নয়। তুমি কেন ওর কবিতা প্রোমোট করবে বার বার?

—তুমি তো খুব বদলে গেছ।

—বদলাতে চাই কুণাল, খুব চাই।

—যাক! তোমাকে এ ভাবে কথা বলতে শুনে···

—রাখলাম।

না না, সময় কোথায় যে সময় বাজে খরচ করবে? নিজের ঘরে বসে ভোলানাথের কথাগুলো ক্যাসেট থেকে কাগজে তোলা দরকার।

রামলাল খাটুয়ার খোঁজ করার জন্যেও ভোলানাথের সাহায্য চাই।

—আসবে না? না হয় চাল নাই আনলে।

—চাল ডালের কথা নয়। আমি খুব ব্যস্ত।

—কি নিয়ে ?

—নিজেকে নিয়ে।

—জয়ির সঙ্গে কি ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে ?

—থাক কুণাল। জয়ির কথা তো আমি কোনোদিন আলোচনা করি নি। করবো না।

ওপরে উঠে আসে সোম। দোকানী মণিবাবু বলেন, সোম! আমার কাছে তো কিছুই কেনো না।

—কার কাছে কিনি মণিদা? একলা মানুষ, কি বা দরকার লাগে!

—আমার একটা উপকার করবে ?

—কি, বলুন ?

—আসব, সময় করে আসব।

—নিশ্চয় আসবে। সাধ্যে থাকলে করব।

মণিদার বাবার দোকান। মণিদা বসছেন এখন। ওঁর স্ত্রী খুব ভুগছেন বলে এখন বিমর্ষ। নইলে হাসিখুশি লোকই ছিলেন। ফুটবলে খুব নাম ছিল। ওঁর ছেলেটি তো ফুটবল খেলার জোরেই চাকরি পেয়েছিল।

ওপরে উঠে এসে ডাক দেখতে থাকে। আমন্ত্রণ পত্রগুলো খুলেও দেখে না। একদা যেত, এখন যায় না, তবু কত আমন্ত্রণ না আসে। জয়ি বলত, সমাজের সঙ্গে যোগ রাখতে হয়। তাই সব জায়গায় যাওয়া দরকার।

এক সময়ে দুজনে সব জায়গাতেই যেত। মার্গসংগীতের জলসা, চিত্র প্রদর্শনী, নাট্যোৎসব, ফিল্মউৎসব, কাব্যনাটক ও অন্যান্য নাটক। জয়ির জন্যে যেত। জয়ি ও সব খুব পছন্দ করত।

একটা প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা জয়িকে থমকে দেয়।

কোনো একটি নাট্যোৎসবে ওদের পাশে এসে বসেছিল মালবী (সেন) মিত্র। সোম তো অবাক। ওরা জানত, মালবী নাচে না।

এখন। খুব মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। ওর স্বামী বাসব ওকে কোনো নার্সিং হোমে রেখেছে, মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছে ঋষিভ্যালির স্কুলে, ছেলেকে দার্জিলিঙে।

অথচ মালবীর মধ্যে সেদিন কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। অস্বাভাবিক এইটুকু, সেদিন ও বিকট সেজে এসেছিল। কথাবার্তাও দিব্যি স্বাভাবিক।

—এই যে জয়ি, এই যে সোম, কেমন আছ?

—আরে, মালবী যে!

—এদের নাটকটা দেখাই হচ্ছে না। ভাগ্যে দেখতে এলাম, তাই দেখা হল।

—বাসব এসেছে?

—ওই তো বসে আছে।

—ছেলেমেয়ে ভালো?

—খুব ভালো। এই, আমার নাচের প্রোগ্রামে এসো কিন্তু, মার্চে শো করছি।

—নিশ্চয় আসব।

চমৎকার কথাবার্তা। বাসব জয়ির কেমন যেন ভাই হয়। বাসব ও মালবী ওদের চেয়ে বড়ো। তবু নাম ধরেই ডাকত জয়ি।

মালবী উঠে যেতে জয়ি বলল, বাসব তো আসে নি। মালবী বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখ।

—যাক না, নাটক দেখ।

পরদিন জানা গেল, মালবী নার্সিংহোম থেকে পালিয়ে গেছে। বাসব গেছে দার্জিলিং।

তারপর দিন জানা গেল, মালবী লেকের জলে ভাসছিল। হত্যা নয়। আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা।

জয়ি বেজায় ঘা খায়। এই কথা বলল, তারপর কি হল যে এ ভাবে মরে গেল?

এরপর জয়ি বলেছিল, এত বাইরে যাব না সোম। খুব একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে যেন, ভালো লাগছে না।

সোম বলেছিল, বাঁচা গেল। সংস্কৃতির সন্ধানে অবিরাম হণ্টন প্রতিযোগিতা আমারও ভালো লাগছে না। বড়ো অযথা সময় যায়, তাই না?

—অত যাব না, ভালো ভালো জায়গায় যাব।

জয়িব তো জনসংযোগ তৈবি করা দবকার ছিল। ওব স্বপ্ন ছিল মস্ত কোম্পানিতে প্রধান জনসংযোগ অফিসার হবে। ঠাণ্ডা গাড়িতে গা ঢেলে আপিসে যাবে, ঠাণ্ডা ঘরে বসবে, একাধিক টেলিফোন থাকবে মস্ত টেবিলে।

সোম জানত না ও প্রবল আকাঙ্ক্ষায় কোনো কিছুই চায় কিনা। ও তো শুধু জয়িকে চেয়েছিল।

আমন্ত্রণ পত্রগুলি ফেলে দাও ঝুড়িতে।

একটি খাম দেখে ওর ভুরু কুঁচকে যায়।

কামাল লোহানির ছবি আঁকা কার্ড। ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণু লাল রং, শোকার্ত বিবাগী ধূসব রং ও উদ্বেলিত সবুজ রঙে আঁকা একটি জেব্রা। নিচে লেখা "এগোনি", যন্ত্রণা। মোটা ফেল্ট কলমে জয়ি লিখেছে, "জন্মদিনে অভিনন্দন।

—জয়ি।"

সোমের মাথা চিনচিন কবে। বন্দোবস্তীর লক্ষ্মণের গণ্ডী ছেড়ে বেরোতে পাবছে না জয়ি। সহজ স্বাভাবিক হওয়া জয়ির পক্ষে বড় কঠিন। সোম তো ওর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানায় না। যোগাযোগ থাকবে না, সেটাও জয়িরই সিদ্ধান্ত।

তা হলে বছব বছর কার্ড আসে কেন?

জয়ি আজ ওর নিজের কোম্পানিতেই প্রধান পি. আর. ও। বহু লোকের জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকীর তালিকা বাখে সেক্রেটারি। দিল্লী ও বোম্বাইয়ের কাগজে, গ্যালারিতে, বিদেশে স্বীকৃতি পাওয়া চিত্রকরদের ছবির কার্ড ওর দপ্তরে থাকে। জয়িকে ও দিন

বুঝে জানায়, জয়ি কার্ড বেছে নাম সই করে, সেক্রেটারি পাঠায়।

এ সব কাজে জয়ি ভুল করে না।

কলকাতা সোমকে ক্লান্ত করছে, গ্রাস করছে। জয়ি, জয়ি, তুমি কার্ড পাঠাও কেন?

জোর করে নিজেকে শাসনে আনে সোম। শিথিল হওয়া কোনো কাজের কথা নয়। জয়ি, সূর্য ও সৌরজগৎ সৃষ্টি হয়েছিল মহাকাশে এক দুর্ঘটনার ফলে। তোমার আর আমার বিয়েটাও একটা দুর্ঘটনা। দুজনের জগতে এমন পার্থক্য! বন্দোবস্তী করে বিবাহিত সম্পর্ক চালানো যায় না। তুমি কি তা বুঝতে চাও না?

না, সবচেয়ে ভালো জীবনের প্রাত্যহিক দাবী।

সোম রান্নাঘরে যায়। ডাল ও ভাত বসিয়ে দেয়। আজ বিকেলে তরকারি কিনতে হবে। কাপড় কাচার সাবান, স্নানের সাবান, সরষের তেল, মাখন। বাড়ির ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা চলে না।

খেয়ে-দেয়ে সোম প্রচুর ঘুমোয়। বিকেলে পাশের ফ্ল্যাটের রেণু মাসি ওকে ডেকে তোলেন। চা এনেছেন, নিমকি। মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই রেণু মাসি ওকে সাধ্যমতো দেখেন, খবরাখবর দেন, ও বাইরে গেলে চাবি রাখেন, রাম সেন তো যখন তখন আসেন।

—চোখ মুখ ধোও, চা খাও।

—এই যে, আসি।

—তোমার সেই খবরের কাগজের বন্ধু বড় জ্বালাতন করে গেছে দুই রাত।

—খুব অসভ্যতা করেছে?

—কি হাঁকডাক, কি মাতলামি!

—এবার ওর আসা বন্ধ করবই। মুশকিল হল, মদ না খেলে কথা শোনে। মদ খেলেই যত পাগলামি!

—রাতে তরকারি দিয়ে যাব তো?

—না, মাসিমা।

—আমার ইস্কুলে ফেয়ারওয়েল হয়ে গেল জানো তো? ওরা একটা টেবিলফ্যান দিল।

—কতদিন কাজ করলেন?

—বছর পঁচিশ তো হবেই।

—এখন মনের সুখে বেড়ান। ছেলেদের কাছে যান, মেয়ের কাছে যান। বাবা, সুজাতা মেয়ে বটে! তিন বছর সে আসে না। খুব সংসারী হয়েছে।

—অপদার্থ! খাচ্ছে আর মোটা হচ্ছে।

—বেড়ান মাসিমা, মেসোমশাইও রিটায়ার করলেন। আপনারা যে কষ্ট করেছেন, আরাম করুন।

—আরাম করতে তো পারি না। কর্তাকে বললাম শাড়ির ব্যবসা করি, সে বলে, "না"। নাও, নিমকি খাও। ভেজেই আগে তোমাকে খাওয়ালাম।

—কবে থেকেই তো খাওয়াচ্ছেন।

—নাও, তোমার মা থাকলে খাওয়াত না? এখন এখানেই থাকছ তো?

—কয়েকদিন তো আছি।

—জয়ি যদি বুঝত···

—মাসিমা, আপনি না কি সকালে হাঁটছেন?

—কর্তার শখ কত! সকালে এক সঙ্গে হাঁটবো, বাজার করে ফিরব, তারপর বলে মোচা রাঁধো, সুক্তো রাঁধো, খুব জ্বালা আমার।

—কতদিন বিয়ে হয়েছে?

—চল্লিশ বছর তো হল।

রেণু মাসি হাসেন। বলেন, তোমার মেসোমশাই বলেছে, এবার বিয়ের তারিখে শাড়ি দেবে না। অঘ্রাণ মাসে তো; দেওঘর নিয়ে যাবে বেড়াতে।

হেসেই চলে যান রেণু মাসি। বেশ মানুষ, গায়ে পড়াপড়ি নেই, কিন্তু সবসময়ে ডাকলে সাড়া মেলে।

চল্লিশ বছর একসঙ্গে আছেন। কর্তা ছিলেন কেরাণী, গিন্নি ছিলেন প্রাইমারি টীচার। দুজনে অনেক টিউশনি করতেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোই ছিল ওই অপার পরিশ্রমের কারণ।

আজ সুজিত বোম্বেতে, বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিতে, অজিত দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারী আপিসে, মেয়ের স্বামী হায়দ্রাবাদে বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে। তিনজনের বিয়েই স্বনির্বাচিত। রেণু মাসি আর মেসোমশাই দুজনে দুজনকে নিয়ে মহাসুখী। ছেলেরা টাকা পাঠায়, আসে যায়।

ওঁরা তো পেরেছেন, সোম আর জয়ি কেন…

কিন্তু সত্যেনকে ঠেকানো দরকার। এখন ও আপিসেই থাকবে। আবার নিচে নামো, ফোন করো।

—সত্যেন ?

—কথা বলছি।

—আমি সোম। তুমি দু'দিন এসেছিলে ?

—হ্যাঁ, মানে জানোই তো বনশ্রী…

—ও ভাবে আর এসো না।

—তার মানে ?

—আমার প্রতিবেশীরা বিরক্ত, অন্যরাও বিরক্ত, আমিও আর চাইছি না তুমি মাতাল হয়ে আসো।

—আজই তো আসব ভেবেছিলাম।

—না, অসুবিধে আছে।

—বুঝেছি, বুঝেছি বাবা! বান্ধবী জুটিয়েছ।

—যা মনে করো।

—কিন্তু আজ যে…

—না সত্যেন।

সোম ফোন ছেড়ে দেয়।

সন্ধ্যার পর টেপরেকর্ডার চালিয়ে কাজে বসে সোম। এখন সে নিমগ্ন, ডুবে যাচ্ছে বনমহোৎসবে, পাখির ডাকে। কিন্তু বাবার মৃত্যু সম্পর্কে মা সত্যি কথা বলে যান নি। অশোকবরণকে জানতে পারলে সোম এমন বায়ুভূত, নিরালম্ব হয়ে বড় হত না।

ভোলানাথ দত্তের গলা যেন গমগম করে। সোম হাসল। গোপালীর ডাকটাও টেপে এসেছে। রাজসিক গলা। ভোলানাথ বলেন, বাইসন।

রাতে সত্যেন আসেনি, কিন্তু সত্যেনের বউ বনশ্রী আর সত্যেনের ভাই দীপ্তেন আসে এগারোটায়।

—সোম, সোম, দরজা খোলো।

দরজা খুলতেই হয়।

—কি ব্যাপার ?

—ও কি এখানে ?

—না তো।

—সত্যি বলছ ?

—খুঁজে দেখ।

—কাল ফেরেনি, পরশু ফেরেনি, আজ সকালে এল। বলল, রাতে তোমার কাছে থাকবে। অমানুষ! অপদার্থ! মানুষই নেই আর!

—মাঝে আমি ছিলাম না। দু'রাত এসে খুব অশান্তি করে গেছে। আমি আজ বাধ্য হলাম ফোন করতে। মদ খেয়ে এখানে আসা আর চলবে না।

—মদ, মদই ওকে খেল। তোমার প্রশ্রয়ে ও···

—বোকো না বনশ্রী। আমি নিজে মদ খাই না, ও এখানে মদ খায় না। মদ খেয়ে আসে। মদ খেলে তোমার কাছে যেতে পারে না। আমাদের জ্বালায়। এটা তো অদ্ভুত ব্যাপার। অ্যালকোহলিক হয়ে গেছে, চিকিৎসা করাও। বাড়িতে গেলে তোমার অসুবিধে, সেজন্যেই তো সত্যেন বন্ধুদের জ্বালিয়ে বেড়ায়, তাই না ?

বনশ্রী চোখ মোছে। একটু চেয়ে থাকে। তারপর খুব আস্তে বলে, বাড়িতে যেতে দিতাম না, তবে বন্ধুদের বাড়ি যেতেও বলিনি। দীপু জানে, আমি বলি, তুমি রাস্তায় পড়ে থাকো। বাড়িতে মাতলামি করলে, আমার শ্বশুরের হার্ট খুব খারাপ সোম! ওই গোলমালে ওঁর একটা কিছু হয়ে গেলে···বাবারই থার্ড অ্যাটাক হয়েছে আজ। আপিস থেকে সন্ধেয় বেরিয়ে গেছে, বলে গেছে তোমার বাড়ি যাচ্ছে। দীপু সোদপুর থেকে এসেছিল বলে ··

—তোমরা চলে এলে, বাড়িতে কে আছে?

—সবাই। বড়দা তো ডাক্তার। মেজদা, ননদরা, শুধু ও একা···

—মা গো! আমি মুখ দেখাব কেমন করে? সবাই আমাকে যা তা বলছে যে।

—বা! সত্যেন মদ খেয়ে বেড়াবে, দোষ কি তোমার?

দীপু বলে, বাড়ি চলো বউদি। ছোড়দাকে চেনে না কে? তুমিই ওকে বাঁচিয়ে চলো, ও কি মানুষ? বাবা, বউ, ছেলেমেয়ে সবাই মরে গেলেও ফুর্তি ছাড়বে?

—হ্যাঁ, চলো। সোম, কিছু মনে কোর না।

—কিসে এলে তোমরা?

—দীপুর গাড়িতে।

—চলো বউদি। জানেন সোমদা, বাবাকে লক্ষ বার সোদপুরে নিতে চেয়েছি। তিনিও তো চেনেন এক ছেলেকে। যাব না রে দীপু, আমি আছি বলে ও তবু বাড়ি আসে। ছেলের তো বাবা বলে কত বিবেচনা। চলো বউদি, তোমারও কপাল!

বনশ্রী হঠাৎ বলে, তুমি নিতে চাইলে কি হবে। শর্মিষ্ঠা যে বলে, ওঁকে হোমে দিয়ে দাও। তাই তো বাবা আমাকে বলেন, আমাকে বাড়িছাড়া কোর না মা।

—ওঃ, যত পুরনো কথা। চলো চলো।

ওরা চলে যায়।

সোম ভাবে কি গোলমেলে হয়ে গেল সব। সত্যেন এখানে থাকলে আজ খবরটা পেত। কোথায় পড়ে আছে কে বলবে।

সত্যেনের বাবা রাতেই মারা যান। সত্যেন যথারীতি সকালে ফিরেছিল।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে সত্যেন বনশ্রীকে বলেছিল, দোষটা তো সোমের। আমাকে বলল ওর বান্ধবী আসবে। আমি যেন না যাই। অথচ তোমরা স্বচক্ষে দেখে এসেছ যে ওর ঘরে কেউ ছিল না। সোমকে যেমন মনে করো ও তেমন নয়।

জয়ির সঙ্গে ও যেমন দুর্ব্যবহার করেছে···

বনশ্রী সব কথাই বিশ্বাস করেছিল।

এরপর সত্যেন নেড়ামাথায় বগলে বোতল নিয়ে হাজির হতে, তাকে তাড়িয়ে দিতে সোমের মনে কোনো কষ্ট হয় নি। অনুশোচনাও নয়।

সত্যেন সোমের শত্রু হয়ে গেল।

কুণালও সব শুনে বলল, হ্যাঁ, সোম যথেষ্ট বদলে যাচ্ছে। এ রকমটা হতেই হবে। এতো একলা কেউ থাকতে পারে ?

এ সব কথা ঘুরে ফিরে কানে এসেছিল অনেক পরে। ততদিনে সোম সত্যিই বদলে গিয়েছিল।

কয়েকদিনই লেগে গেল ভোলানাথের কথাগুলি লিখে নিতে। তারপর রেণু মাসিকে সুজিতের উপহার রেকর্ডার এনে আরেকটি ক্যাসেট করে নিল। ভোলানাথের লেখাটা টাইপে দু'সেট করে নিল। ভোলানাথের কাছে থাকবে একটা।

ভোলানাথকে লিখল, "আপনাকে দশ পাতা লিখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু এখন লিখব না। ঘুরে আসি তারপর লিখব। রামলাল খাটুয়ার খোঁজে যে যাব, কি ভাবে কোন পথে যাব, কার সঙ্গে দেখা করব লিখে জানান। আপনি ভালো থাকবেন, অপেক্ষা করবেন। খোঁজ পেলে আমি এসে আপনাকে, রাম সেনকে নিয়ে সেখানে আবার যাব। ভাবতেও ভালো লাগছে আমার। আপনি যে

আমাকে কি ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়েছেন, তা আপনিও জানেন না। আপনাকে তো আপনার পুরনো কর্মক্ষেত্রে একবার যেতেই হবে। গাছ লাগানো ওখানে খুব দরকার। আপনি আপনার কথা বলবেন। এবার ভিতরগাছি গেলে আপনার জন্যে সাদা চাঁপার গাছ নিয়ে যাব আমার বন্ধুর নার্সারি থেকে। পুকুর পাড়ে লাগাবেন। শরীর ভালো রাখবেন। সুরোদিদিকে, ওর ছেলেদের ভালবাসা জানাবেন। আপনি আমার প্রণাম নেবেন—সোম।"

রাম সেনকে লিখল, "আপনার দুটো চিঠিই পেয়েছি। মিতালির স্বামী তাকে বাড়িটি লিখে দিচ্ছে কিনা, দেখবেন্। মুখের কথা সব নয়। দীপালির কথা ভাবি। সে তো মনে দুঃখ পেতেই পারে। ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেলে বড় বোনের মনে কষ্ট হবে। তবে আপনি যে একজনের বিষয়ে চিন্তামুক্ত হলেন, সে জন্য আমার ভালো লাগছে। দীপালির কোনো একটা ব্যবস্থা হলে আপনি বাকি জীবন আমার কাছেই থাকতে পারতেন। সেবার পায়ে কড়া দেখেছি। এবার এখানে থেকে ওগুলি কাটাতে হবে। গেঞ্জি কিছু দামী ছিল না। আর আপনাকে দিতে হলে সবচেয়ে শস্তা জিনিস দেব, এই বা কেমন কথা? এবার দীপালিকে নিয়ে কলকাতা এসে কয়েকদিন থাকুন। ওর মনটা ভালো লাগবে।

এবারে একটা আশ্চর্য খবর দিচ্ছি। আপনাকে যিনি "লেঠেল রাম" বলেন, সেই ভোলানাথ দত্তের কাছে গিয়েছিলাম। আপনার কত কি কথা শুনলাম। ওঁর ঠিকানা, গ্রাম ও ডাক ভিত্তরগাছি, উত্তর চব্বিশ পরগনা। আপনি না বললে আমার তো এ কাজে আগ্রহই হত না। আপনি না থাকলে আমি হয়তো ভেসেই যেতাম। কত বছর ধরে আমাকে আগলে চলেছেন, এখন বুঝি। শুনুন, আসলামের কথা, বেঙা বেঙির কথা, সব জেনে এসেছি। রামলাল খাটুয়ার সন্ধান করতে যাব। খোঁজ যদি পাই, ফিরে এসে আপনাকে আর ভোলানাথ দত্তকে নিয়ে আপনাদের পুরনো কর্মক্ষেত্রে আবার যাব। আপনারা দুজনে আমার মনে বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছেন,

বাঁচিয়ে দিয়েছেন। শরীর ঠিক রাখবেন। এখন আপনাকে অনেক দিন বাঁচতে হবে। দীপালিকে স্নেহ জানাবেন। আপনি আমার প্রণাম নেবেন। কাচ মেরামত করাব, বাথরুমের কলটা বদলাব। এবার এলে সব গোছানো পাবেন।—আপনার সোম।”

যাবার আগে আরো যেন কি করার আছে। যাবার আগে! দূরত্বের দিক থেকে তো দূর নয়, তবু এ এক বড়ো তীর্থযাত্রা। তীর্থই তো! রাম সেনের স্নেহ পাওয়া মানে তীর্থস্নান, ভোলানাথ দত্তকে দেখা মানে তীর্থদর্শন। ভোলানাথ দত্তকে বৃক্ষ রোপণের জন্যে কেউ জাতীয় পুরস্কার দেবে না বলেই তিনি মহান। আব রামলাল খাটুয়াকে যদি পেয়ে যায়!

সোমের সাংবাদিক বন্ধুরা থাকলে বলত, সাবজেক্টের সঙ্গে বড় বেশি জড়িয়ে পড়ছ সোম। এ করলে বাঁচতে পারবে তুমি?

সোম তো চিরকালই জড়িয়ে পড়ছে।

এটাকে সে নিজের অক্ষমতা মনে করত।

আজ ও বুঝছে, সমাজব্যবস্থা এ রকম বন্দোবস্তী করেছে, দেশ ও মানুষের কথা লেখো, কিন্তু ভালবেসো না। জড়িয়ে পোড় না।

রাম সেন বলেন, আইজকার কর্মীরা বুঝে কিছু? আমরা কিশোর কাল হইতেই দুর্ভিক্ষ ত্রাণে, খরা ত্রাণে, বন্যা ত্রাণে গ্রামে যাইতাম। দেশের অবস্থা বই পইড়া বুঝতে হইত না। দেইখা জানছি। দেশ, বল, মানুষ বল, রাজনীতিক কর্মীরে ভালবাসতে হইব। নইলে কাম হয় না, হইত্যাছে না। ভালবাসার অভাবে দেশ মইরা গেল, অরা কলকাতায় নাচ-গান করাতে আছে, ঘন ঘন বিদেশ যাইত্যাছে, দূরে বইয়া নির্দেশ দিতাছে। ভালবাসার দায়িত্ব যে বড়ো কঠিন। অরা আর পারত না। যাগারো কাছে রাজনীতি মানেই দলের জন্য ফায়দা উঠান্। তাগারো পক্ষে দেশকে ভালোবাসা কি সম্ভব? সগল দলগুলি দলের স্বার্থে সাধারণ মানুষরে বলিদান করত্যাছে। ভালবাইসা আউগাইলে অরা মান্ষের কাছে সারা পাইত।

এটাই তো সত্য কথা। এই সব সত্যের কাছে বন্দোবস্তীর আক্রমণ পরাভূত।

এ সব করে নি যারা, তারাই সফল সাংবাদিক।

ওর দিল্লীর বন্ধু আজাদ সেদিনও অসম্ভব সম্মান পেত তদন্তধর্মী লেখার জন্যে। সাংবাদিকরা তো এ দেশে আজও যথার্থ স্বীকৃতি পায় না। সত্য উদ্‌ঘাটন করতে গেলে কত সাংবাদিক নিগৃহীত হয়, প্রাণও হারায়। বন্দোবস্তী নিয়ম যাদের, তারা সাপের এবং ব্যাঙের মুখে এক সঙ্গেই চুমু খেতে জানে। সাংবাদিকরা কলম না ধরলে .দশেব বহু অত্যাচার-অবিচারের কথা বেরোত না। প্রতিটি রাজ্য-সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার চায় নির্লজ্জ স্তাবকতা কিংবা বিরোধী দলের সমালোচনা।

সাংবাদিকদের যে আন্‌ইন্‌ভল্‌ভড্‌ থাকতে হয়, সেটাও বন্দোবস্তীর নিয়ম।

দেশ ও মানুষকে ভালোবাসা, তার দুঃখে দুঃখী হওয়া, তার নির্যাতন ও শোষণের প্রতিকার খোঁজা তো বৃহত্তম ভারতবর্ষে সর্বত্র বৃহত্তম অপরাধ।

গণবিচারের নামে কৃষক মারো।

কৃষক জল চাইলে গুলি ছোড়ো।

যাদের গুলি করতে পারছ না তাদের চরিত্রহনন করো, বলো ওরা বিদেশী পুঁজির দালাল।

প্রতিবাদী কণ্ঠগুলি জেলে বন্ধ রাখো।

প্রতিবাদী মানুষদের নিয়ে মৃগয়া করো।

নিজেরা পকেট গোছাও দলীয় ফান্ড বাড়াও, সর্বশক্তিমান দানব হও। দশ হাতে জনগণকে ধরে রক্ত পান করো।

জলের টাকা, সেচের টাকা, আদিবাসী-এলাকার টাকা, সব খেয়ে চলো অবিরাম। এ এক অনির্বাণ ক্ষুধা।

সাংবাদিক ছাড়া এ সব কথা লেখে কে?

যতটুকু লেখার, তারাই লেখে।

আজাদের কথা মনে পড়ে। ওড়িশায় জেলেদের অবস্থা, বন্যার্ত আসাম ও বাংলাদেশের কথা, সিমেণ্ট কারখানার কারণে শস্যক্ষেত্র নষ্ট হওয়া, আন্ত্রিক ভাইরাসের গোপন রহস্য, এমন কত খবর ও লিখেছে।

অথচ ওর বসন্ত বিহারের ফ্ল্যাট, বিদেশিনী বান্ধবী, বিশাল কফিনের মধ্যে মদের বোতল (চমকে দেবার জন্যে), এসব দেখে সোম বলেছিল, কি করে?

—কি, কি করে?

—ওই সব লিখছ, এভাবে থাকছ!

—কেন?

—টাকার কথা বলছি না। শিশু ক্রীতদাস রামাইয়ার কথা চোখে দেখে এসে তবে তো লেখো?

—নিশ্চয়।

—তারপর এরকম জীবন···অসুবিধে হয় না?

আজাদ বলেছিল, অসুবিধে হবে কেন? হতে দেব কেন। লিখছি ঠিক কথাই, কিন্তু আমি তো মনের দিকে নিজেকে ঠিক রেখেছি, জড়িয়ে পড়ছি না। অর্থাৎ ইমোশনালি ইনভল্‌ভড্‌ হচ্ছি না। সো!

—সেটা কি ঠিক?

—পাক্কা প্রফেশন্যাল হতে চায় যে সে বলবে আমার কথাই ঠিক। আর যে এসব ব্যাপারে ইমোশনালি ইনভল্‌ভড্‌ হবে? ম্যান। তাহলে সে যেয়ে বিপ্লব, সমাজসেবা, মানবসেবা, (সবই নিঃস্বার্থ হতে হবে) যা হয় একটা করুক।

—ও!

—সবচেয়ে মুশকিল তাদের, যারা না এটা, না ওটা। আর আমার কথা বলছ? আমি প্রফেশন্যাল। রামাইয়ার কথা লিখে তোমাকে কাঁদাতে পারছি সে জন্যেই। সোম! তুমি খুব বোকা।

আজাদ বর্তমানে এক শিল্পপতি মালিকানার ইংরেজি দৈনিক (পাঁচটি রাজ্য থেকে প্রকাশিত), ইংরিজি সাপ্তাহিক (সংবাদধর্মী),

ইংরেজি পাক্ষিক (মেয়েদের ফ্যাশন-রান্না-বিবাহঘটিত গোলমাল-ড্রাগ নেশা-মদ্যাসক্তি-শিশুপালন-ডাক্তাবী পবামর্শ এবং উঁচু সমাজেব ধনী মেয়েদের পছন্দমতো গল্প-আন্তর্জাতিক কেচ্ছা), এই সব কিছুব নিয়ন্তা। আজ সে দিল্লীতে, কাল ওয়াশিংটনে ও পরশু ম্যানিলাতে। দিল্লিতে তাব নিজস্ব বাড়ি। এ বাড়িতেও তাব মদ থাকে কফিনেব মধ্যে। কফিনটি অতিকায়, ওপরে লেখা ড্রিংক টু ডেথ। আজাদেব বাড়িতে লেখাব ঘবেব দেয়ালে আগাগোড়া আয়না। আজাদ যখন কলম ধরে, ষোলজন আজাদ কলম ধরে।

বোকা সোম, চালাক না হতে পারা সোম, জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে চলা সোম, রামলাল খাটুয়ার খোঁজে যাবার ব্যাপারে অত্যন্ত উত্তেজিত বোধ করে, অত্যন্ত ইনভল্‌ভড্‌, নিজেকে আবিষ্কাব করতে যাচ্ছে যেন, একা রামলালকে নয়।

যাবাব আগে, যাবাব আগে, এখন হঠাৎ মনে পড়ে সুকুমাব মল্লিকেব নাম। আগে কেন মনে পড়েনি?

সুকুমার মল্লিক ওদেব বাড়িতে আসতেন, মার সঙ্গে কথা বলতেন। কোথায় যেন বাড়ি, হ্যা, অখিল ব্যানার্জি রোডে। টেলিফোন না থাকলেও সোম ডিরেকটবি কিনে রাখে।

ফোন বেজে যায় কিছুক্ষণ। তাবপর একটি বিরক্ত বালিকা ফোন ধরে, হ্যালো!

—সুকুমার মল্লিক আছেন?

—না।

—কোথায় গেলে তাঁকে পাব।

—মস্কোতে।

—কবে ফিরবেন?

—দিল্লিতে ফিরবেন। শুনুন, আপনি ফোনটা ছেড়ে দিন। আমার একটা ফোন আসবে।

দোকানী হাসে। বলে, লোকসভা সদস্য। আমরা হাসপাতালে যাই। ওরা মস্কো যায় চিকিৎসা করাইতে।

আউট ! সুকুমার মল্লিককে কোনো প্রশ্ন করা আউট। দোকান কর্মী নিখিল বলে, ভাইটার চাকরির জন্য কম ছুটছি ওর কাছে ? দেখাই পাই না। অথচ ওরাদের বাড়ি আমাদের বাড়ি একই গ্রামে আছিল।

আর থাকল জয়ি। জয়িকে চিঠি লেখাই ভালো।

'জয়ি ! খানিকটা দেখে এসেই মনে হচ্ছে সব বন্দোবস্তী হয়ে যায়নি। বস্তুত কলকাতাতেও সর্বত্র নয়। পাশের বাড়ির রেণু মাসিমা আর মেসোমশায় বিয়ের চল্লিশ বছর পেরোতে চলেছেন। এখনো দুজনে দুজনের কাছে খুব দরকারী।

তোমাকে রাম সেন, ভোলানাথ দত্ত, এঁদের কথাও বলতে পারতাম। বলব না, তুমি বুঝবে না।

বন্দোবস্তী, বা অ্যারেঞ্জমেন্ট ভূপালের গ্যাসের মতই সত্যি। মানুষকে বিষাক্ত করছে, গরিবকেও ছাড়ছে না। কিন্তু সেটা আমি নিজেই বুঝি নি এখনো চোখে দেখে, তাই তোমাকে বোঝাতে যাব না। বোঝানো কঠিনও।

তুমি আমি, বিশেষ তুমি, যে সমাজকে দেখছ সে সমাজে নিশ্চয় বন্দোবস্তীর প্যাটার্ন এসে গেছে। এসব সমস্যাও বাস্তব। কিন্তু এটা সমাজের একটা অণু অংশ।

সমাজের বৃহত্তর অংশকে বঞ্চিত রেখে একটা বহুতল সমাজ তৈরি করা চলেছে, যেটার ভিত মাটিতে নয়। সেখানে যা হচ্ছে, সেটাই শেষ সত্য, তা কেমন করে হবে ?

তুমি ঠিকই বলেছিলে। আমার নিজেকেও খোঁজা দরকার ছিল। সেই কাজটাই করছি, এবং জীবনে প্রথম আনন্দ পাচ্ছি, সার্থকতার বোধ হচ্ছে। এটাও তোমাকে বোঝাতে পারব না। তোমার সমর্থন পাব না। তোমাকে আমি জানি।

আমার জন্মদিনে তুমি শুভেচ্ছা জানিয়েছ। তোমার জন্মদিনে আমি শুভেচ্ছা জানাই না। অনেকগুলো কাজ আমরা করতে হবে বলে করে যাই, না করলেও পারি।

এবারে আমাদের সম্পর্কটাও ভাল করে ভাবতে হবে, অনেকদিন তো হল। তুমি বনশ্রী বা রেণুমাসি নও। আমিও সত্যেন বা মেসোমশাই নই। সত্যেন প্রত্যহ মদ ছাড়ে, প্রত্যহ মদ খায়। মদ খেলেই বন্ধুদের কাঁধে চাপে। বনশ্রী ভাবতেও পারে না যে দায়িত্বহীন স্বামীকে সমালোচনা করা যায়। কত মানুষ কত রকম, কোন্ অঙ্কের প্যাটার্নে ফেলবে? আমি বাইরে যাচ্ছি।

—শুভার্থী সোম

চিঠিটা ফেলার পর মনে হল, 'বাইরে যাচ্ছি' লেখাটা কি ঠিক হল? জয়ি নিশ্চয় ধরে নেবে ও বিদেশে যাচ্ছে। জয়ির বাড়ি, পার্টি, বড় চাকরিতে বড় পার্টি দিতে হয়। অবশ্যই অফিস খরচ দেয়। আজাদের 'উওম্যান, উওম্যান, ওহ্' কাগজের মলাটে জয়ির ছবি ও ভেতরে ওর বিষয়ে বিশাল সাক্ষাৎকার বেরোবার পর পার্টি দেবার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে।

জয়ির বাড়িতে পার্টি। নো লোডশেডিং। সমগ্র বাড়িটিতে জেনারেটর, প্রতিটি ফ্ল্যাটে আলো-পাখা দেয়। সম্ভবত এয়ার-কণ্ডিশনারও। যদিও জয়ি নিজের জন্মদিনে মোমবাতির আলোয় পার্টি দিতে ভালোবাসে।

অনেক লোক, অনেক। জিরাপানি ও ঠাণ্ডাই থেকে মদ। স্ন্যাকস। শিল্পপতি, ডাক্তার, নাচিয়ে, বিজ্ঞাপন অফিসের বাঘ সিংহ, আধুনিক শিল্পী, ফ্যাশন ডিজাইনার, বিদেশে ভারতীয় শিল্প দ্রব্য রপ্তানিকারিণী মহিলারা, কে থাকে না সেখানে?

জয়ি তাদের মধ্যে ঘুরছে, ফিরছে।

—সোম বাইরে গেছে, জানো?

—কোথায়?

—যে কোনো জায়গায় হতে পারে।

'বাইরে' মানেই বিদেশ। কোন্ দেশ তাতে কেউই আগ্রহী হয় না। কেন না আজকাল বহু লোকই বছরে নব্বই দিন (এয়ার টাইম) উড়ো জাহাজে থাকে।

রাম সেন হরিপুর থেকে কলকাতা আসাকে বলেন, লং জার্নি। ভোলানাথ তো ভিতরগাছি থেকে টাউনে, অর্থাৎ বনগাঁতেও পারত-পক্ষে যান না।

জয়ি যদি জানে ও কোন্ বাইরে যাচ্ছে তাহলে অত্যন্ত আঘাত পাবে।

কিন্তু ও অঞ্চলটা চেনে জানে এমন লোকের সন্ধান কে দিতে পারে ?

সত্যেনের ভাষায় সময় ভালো যাওয়া মানে বেস্পতি তুঙ্গী। কলকাতায় দু-চারদিন দেরি করার ফলে সোমের ভালোই হয়।

ভোলানাথ দত্তের পোস্টকার্ড, খড়্গাপুর হইতে নারায়ণ গড়গামী (দীঘাগামী আসলে) বাসে বেলদা নামিবে। বেলদা হইতে পূর্বে মগনাদি। ওখানে গজানন বেরার খোঁজ করিবে। সে সন্ধান দিতে পারিবে। হাঁটা পথে তিন মাইল বেলদা হইতে।

॥ ৯ ॥

খড়্গাপুরে যাবার অনেক ট্রেন। সোম ভোরের ইস্পাত ধরেছিল। খড়্গাপুরে বাসের হাট। একটি দোকানে চা ও লুচি খেয়ে একটি প্রাইভেট বাসে ওঠা।

বাসের নাম 'শুকতারা' এবং বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী আগাগোড়া পথ হিন্দী গান ক্যাসেটে বাজল। বেলদাতেই অনেকে নামল। চায়ের দোকানী বলল, নারাণগড়ের ব্লক অাপিস, ব্যাঙ্ক, সবই বেলদাতে।

—যাবেন কোথা ?

—মগনাদি।

—রিকশা নিন।

—যায়।

—একটি ছেলে, বাবরি চুল ও মোপেডবাহিত, সে রুক্ষ গলায় বলল, এটা আমাদের পঞ্চায়েত। রাস্তা আমরা করেছি।

একটি রিকশাচালককে পাওয়া যায়, যে মগনাদি যাবে। তার রিকশাতে ওঠে সোম। চালকটি বলে, বৈতাল ছুটো রাখব ?

বৈতাল নাম, বস্তুটি কুমড়ো। এক হতভাগ্য চেহারার বুড়োকে চালক বলে, রাখো বাবা।

—ও তোমার বাবা ?

—হ্যাঁ বাবু।

—ওঁকে উঠে আসতে বলো।

—বাবা উঠবে ?

—কেন উঠবেন না ?

—বাবরিচুলো ছেলেটি বলে, যাও যাও, উঠে পড়ো। দেখ ! তুনিয়াতে কত রকম লোক আছে ! আপনি যাবেন কোথা ? কার বাড়ি ?

—গজানন বেরা, চেনেন ?

—গজানন বেরা !

ছেলেটি কোনো কৌতুক বোধে হাসে। রিকশা চলে। চালক ও তার বাবা নিশ্চুপ।

—আপনারা ওকে চেনেন ? যে কথা বলল ?

বৃদ্ধ বলে, হ্যাঁ বাবু। প্রধানের ছেলে।

—কি করে ?

—ঠিকাদারী।

চালকটি কোনো চাপা ক্ষোভে বলে, চাপা কল বসায়, জল ওঠে না, আবার বসায়, টাকার কুমির হয়ে গেল।

—এই নিমাই, চুপ কর।

—একটা স্যাল্যের জন্যে···

—বাবু, নিমাইয়ের কথা ধরবেন না।

মগনাদিতে ঢোকার মুখে কাঁচা মাটি ফেলা পথ।

—এখানে এক কালে বন জঙ্গল ছিল না ?

—ছিল বাবু। স—ব···শাল জঙ্গল !

এখন সবই ধানক্ষেত। দূরে ইউক্যালিপটাসের গাছ। সামাজিক বন সৃজন প্রকল্পের ফসল।

—এখান হতে কতদূর অবধি বন ছিল! বন কাটা পড়াতে তবে তো লোধারা এল বাইরে। বন থাকতে বারায় নি। বারাবে কেন? বনেই শিকার, ফল, পাতা, ধুনা, মধু, কান্দা মূল! আমরাও খেয়েছি।

—ওসব গাছ?

—ফরেসের বাবু!

মগনাদি যথেষ্ট বড় গ্রাম। পাকা বাড়িগুলি নতুন। কাদের, তা বলে দিতে হয় না। বৃদ্ধই সব বলে দেয়। ওই দিকে মুণ্ডা, সাঁওতাল। ওই দেখেন গজানন বাবুর বাড়ি। এখানে নামুন বাবু। এটুকু হেঁটে যেতে হবে।

তিন টাকা রফা হয়েছিল, সোম পাঁচ টাকা দেয়। নিমাই বলে,

—যদি ঘোবেন, যদি গাড়ি লাগে, গজাননবাবুকে বললেই আমাকে খবর দেবে।

মাটির ঘর, টিনের চাল। উঠোনে খড়ের গাদা।

গজানন বেরা বেরিয়ে আসেন।

বছর ষাট বয়স হবে। নিকষ কালো রং, চুল কাঁচা পাকা। চোখে যথেষ্ট বিস্ময়।

—আপনি কে?

—আমার নাম সোম চৌধুরী।

—তা...আমার এখানে...

—ভোলানাথ দত্ত আপনার কাছে আসতে বললেন। কৃপাসিন্ধু বাবু তো নেই, তাতেই...

—আমার কাছে! আমাদের ভোলাবাবু! বেঁচে আছে?

—খুব। লেঠেল রামও বেঁচে আছেন।

—বাপ রে! কোন যুগের কথা সব! আসুন, ভেতরে আসুন। তা আপনার কাছে?

—রামলাল খাটুয়ার কাছে যাব বলেই বেরিয়েছি। তিনি বিরগেড়িয়াতে থাকতেন···

গজানন মাথা নাড়েন, বিরগেড়িয়া নাম আর নেই বাবু। যা ছিল বিরগেড়িয়া তা এখন নয়াবসত। রামলাল· ·

—গান গাইতেন।

—ও, সেই রামলাল···সে তো নয়াবসতে নেই বাবু। আদিবাসীরা উচ্ছেদ হল, সেও ওদেব সঙ্গে গেল। দাঁড়ান, কোথা গেছে আমি মুণ্ডা পাড়ায় জেনে আসব।

—একটু জল খাব।

—আমার ঘরেও নেই কেউ। সবাই লোধাশুলি। আমার শ্বশুববাড়িতে শীতলা পুজো আছে। তা এমন অসময়ে এলেন—কিছু তো করা দরকাব

—আপনার খাওয়া হয়ে গেছে ?

—না।

—ভাববেন না। দোকানে মুড়ি পাব না ?

—স্নান তো করবেন।

—হ্যাঁ, তা করব। পুকুর আছে ?

—আছে···আমরা যেতে পাবি না।

—কেন ?

—সে অনেক কথা। জল এনে দেই ?

—কোথা থেকে ?

—বাঁধ আছে একটা···

—কতদূরে ?

—কত আর ? আধ মাইল হবে।

গ্রামের লোকদের দূরত্ব বিষয়ে ধারণা ও রকমই। তা সোম আগেও দেখেছে। গজানন একটি ছেলেকে ডেকে দেয়। শীর্ণ দেহ, ঢোলা হাফ প্যান্ট দড়ি দিয়ে বাঁধা।

কার্যকালে ওরা মাইলখানেক হাঁটে। বাঁধ বলতে লম্বা মাপের

পুকুর। জল নিচে। খেজুর গাছের গুঁড়ি পাতা ঘাট। ছেলেটি বলে, সাবধানে নেমেন।

স্নান করে উঠে আসে সোম। বাঁধের চারপাশে অফলা মাঠ। অথচ খানিক দূরেই সবুজ ধানক্ষেত।

—এগুলো ক্ষেত নয়?

—হ্যাঁ।

—চাষ হয়নি?

ছেলেটি সে কথা শুনতে পায় না যেন। বোবা থেকেই ও সোমকে পৌছে দিয়ে যায়।

গজানন বলে, আপনার কপালে আজ আলুপোড়া আর ভাত, আর কিছু নেই।

—আবার রাঁধলেন?

—না সকালে আগার দু' বেলারটা রেঁধেছিলাম। খেয়ে জল দিয়ে রাখতাম। ও বেলা নয় রাঁধব।

কুশলী হাতে গজানন ভাত বাড়ে দুটি সানকিতে। আলুপোড়া মাখা, লবণ, পেঁয়াজ, লঙ্কা পোড়া, তেল।

—খেতে তো খুব ভালো।

ভাতের হাঁড়ি ও তুলে রাখে। সিকেয়। তোলা জলে সানকি ধোয় মাজে। তারপর বলে, বিড়ি চলবে?

—আমি সিগারেটও খাই কম···দিন!

বিড়িতে সুখটান দিয়ে গজানন বলে, ইনি আমার দ্বিতীয় পক্ষ। প্রথম জনা তো মরেও গেছে। একটা মেয়ে, বিয়ে দিয়ে দিয়েছি···

গজাননের ভুরু ঝাঁকড়া, কানে ও আঙুলের গাঁটে লোম। সে কোনো গভীর বেদনায় খড়গাদার দিকে চেয়ে থাকে। বলে, সে ছিল লক্ষ্মী। এর সংসারে মনই বসে না। হক-না-হক বাপের বাড়ি দৌড়ায়।

—পুজো আছে বললেন তো!

—বছরে চারবার শীতলা পুজো করে। অবস্থা ভাল এখন। আগে

কিছু ছিল না···তা বাদে পার্টিতে ঢুকল···এখন জমিজমা···সেদিন বলদ কিনল···পুকুর কাটাচ্ছে বউ বলে যাই দু'দিন খেয়ে মেখে আসি।

—বাঁধটার আশপাশে চাষ হয় না কেন?

কে যাবে বাবু? ওই বাঁধটা আমরা দশ বছরের চেষ্টায় তবে তিন বছর হল করাতে পেরেছি। তাতেও বিশ ফুট করল না, জল তো থাকে না···নারাণগড়ে বড় জলকষ্ট জানলেন? তা, যখন চেষ্টা করছি, দৌড়াচ্ছি, বাঁধের আশপাশে জমি তো আমার মতো ক্ষুদ্র লোকের··· সেচ হবে···

—হল না?

—না। যখন চেষ্টা করছি তখন মুক্তারাম প্রধান। অঞ্চলেও সে প্রধান! তিতামারা গ্রামে থাকে। বাঁধের জমি সে-ই দিল। তা বাদে সে তো যেয়ে পার্টি হল। বাস! বাঁধ হল, বি ডি ও এল, খুব ফটোক খ্যাঁচাখেঁচি। তা বাদেই মুক্তারামবাবু চার পাড় দিয়ে ওর জমিতে ইনজানসান বের করল।

—এমন হতে পারে?

—দেখছেন তো। সব হয় বাবু! এখন···তাতে আমরা সেচ পাই না। তবে স্নান করি, জল নিই···সেটুকু আমরা আদায় করেছি।

—ওর ছেলেই মোপেড চালায়?

—হ্যাঁ। তিতামারায় পাকা বাড়ি, দু'খানা ঘর দোতলা করল, নিচে খড়কাটা মেশিন চলে। আর এখন শুনছি বেলদাতেও বাড়ি করছে। শোবেন একটু?

—না, আপনার কথাই শোনা যাক।

—আর বাবু! কালীপদ সিং মুণ্ডী বটে, কিন্তু লোকটার জেদ খুব। আমাদের দুঃখের কথা! লেখাপড়া জানে। পার্টির নীরেন বাবুকে ধরে পড়ল। বাবু! আপনাদের পার্টি কবে করেছি···

—আপনারা অনেকেই?

—হ্যাঁ বাবু। আগে তো ওনারাই ছিল···যা দিনকাল! কোনো পার্টির মানুষ না থাকলে কোনো ভরসা নেই।

—তারপর?

—আমদের তো বিশ্বাসই করে না এরা। বলে তোমরা ওই পার্টির লোক···তা জলকষ্ট খুব ··আমরা, মগনাদির সকল পার্টির ক্ষুদ্র চাষী এক হয়ে স্যালোর জন্যে ওনাকে ধরলাম · কোথায় স্যালো বসবে, কত দাগ নম্বরে! কতজন জমিতে সেচ পাবে···তা ওনার ভাইপো এল।

—ভাইপো?

সজ্জন মানুষ। ছোকরা ছেলে। সরকারের কোন আপিসটায় কাজও করে···সব স্বচক্ষে দেখল। তারপর জানেন? কাছ অবধি গণদরখাস্ত গেল।

—তারপর?

—তিনি 'হ্যাঁ' জানাল। তা এসব তো করার কথা পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েতের কি হাসি। কলকাতায় খুঁটি ধরেছ, এখন স্যালো পাবে, চাষ হবে।

—হল না?

—মন্ত্রী বলল হবে, ব্লক বলে হবে, আমরা বেলদা হতে মেদিনীপুর দৌড়ে দৌড়ে কত খরচ করলাম···তারপর নিস্‌পেকশন হল, সব হল। কিন্তু তারপর?

—কি হল?

—ব্লকে স্যালো স্যাংশন হল, কিন্তু আমরা পেলাম না। আমরা পেলাম না বাবু! প্রধান যেথা বলল, সেখানেই হল। কালীপদ যে কত কাঁদল!

—সেই ভাইপো?

—তিনি কি করবে বাবু? সে আবার এল। বলে, তোমরা মাত্বরকাটি কিনে ঘরে ঘরে মাত্বর বুন, পাঁচ জাতকে নিয়ে মাত্বর সমবায় করতে হবে।

—হয়েছে ?

—না। সে লোক কাগজপত্র, রেজেস্ট্রি সব করাল। কিন্তু বেলদা আপিস দারুভূত জগন্নাথ। তাও আমরা করতে পারি নি। আমাদের দুঃখের কথা ! অথচ আদিবাসী এলাকা ! নারাণগড় ব্লক ! টাকা ফেরত যাবে তাও ভালো, কিন্তু কিছু করবে না। এ সব শুনি বাবু, সত্যি মিথ্যে জানি না। তবে জানবেন, আমরা ভাদরে কর্জ নেব, কার্তিকে পেটের দায়ে হাঁস মুরগি থালাবাসন, জমি, বাঁশঝাড়, সব বেচব, নয় বাঁধা দেব। অঘ্রাণে ধান কাটব যার আছে, যাকে কাজে নিচ্ছে, তা বাদে বাঁধনা পরব হতেই সব ছেড়ে নানাখান হয়ে কাজের খোঁজে যাব।

—জমি···বাঁশঝাড়···

—যা যায়, তা কি আর ফেরে বাবু ?

—না ফেরে না।

—আদিবাসী সকলে ভূমিহীন নয়, তবে অনেকে হচ্ছে, বছর বছর হচ্ছে।

আদিবাসীর জমি অন্য কেউ···

—আইনের কথা বলছেন ? আইন সবাই জানে। কিন্তু বাবু! আদিবাসীর জমি বাঁধা রাখল অন্যরা, নামে দেখল আরেক আদিবাসী বাঁধা রেখেছে।

—খুব, খুব দুঃখের কথা।

—আপনি এসে পড়েছেন···শুনলেন·· খানিক দুঃখ পেলেন··· আমরা তো এরই মধ্যে আছি বাবু!

—বিকেল হয়ে গেল।

—বাবুর চা চলে ?

—দোকানটা কোথায় ?

—মুদীর দোকান ? ওই তো। কেন ?

—থামছি।

কিছু চাল কেনে সোম, এক কিলো ডাল, গুঁড়ো চা, চিনি, চার বাণ্ডিল বিড়ি।

গজানন নিঃশব্দে সবই নেয়। 'কেন আনলেন' বলে না। বলে, চা খেয়ে আপনি ঘরে থাকবেন। আমি মুণ্ডাপাড়ায় যাব। ওরা জানবে।

—প্রধানের ছেলেকে যেন দেখলাম।

—সে আসবে তাহলে।

কালো চা, দুধ নেই। গজানন বলে, আগে কুয়া থেকে জল এনে রাখি খানিক।

চলুন আমিও যাই।

—যাবেন ? চলুন !

—কলসি নেই।

—আছে। ননী ! ননী রে।

গজাননের সগর্জন ডাকে সকালের সঙ্গী সেই ছেলেটি ঢোকে। গজানন বলে, একটু দাঁড়া বাবা, জল আনতে যাব।

—পয়সা দাও, আমি এনে দিচ্ছি।

সোম বলে, কত পয়সা নিবি ?

—যা দেবে !

গজানন বলে, ও জল আনুক। আমি কালীপদকে ডেকে আনি। ঘরে আছে তো ?

—হ্যাঁ, খড় কুচাচ্ছে।

ছেলেটি জল আনতে যায়, গজানন বেরিয়ে যায়। জল এনে ছেলেটি রাখে। একটি বালতি, এক কলসি।

সোম একটা টাকা দেয়। ছেলেটি টাকার দিকে চায়, ওর দিকে, তারপর দৌড় মারে।

এবং মোপেড আসে। সঙ্গে আরো দুজন লোক। বয়স্ক। একজন কৃষক বলে মনে হয়, আরেকজন কোনো চাকরি বা কারবার করেন বোধহয়। পরনে টেরি পাঞ্জাবি, বিকট ময়লা, ধুতি, হাতে ভালো ঘড়ি।

—এই যে ইনি।

সোম বলে, আপনারা ?

—আমি সমর প্রধান।

—আমার নাম ভানু সান্না।

—আমি দশরথ মাইতি, মাস্টার।

—বসুন।

ওরা বসে না। দশরথ বলেন, শুনলাম প্ল্যানিং বোর্ড থেকে এসেছেন ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—কাজ আছে।

—গজাননের কাছে ?

—হ্যাঁ, ওঁর কাছেই।

—সেই স্যালোর ব্যাপারে ?

সোম ভিতরে ভিতরে চটছে। কিন্তু গজাননকে বিপন্ন করে লাভ নেই।

—স্যালো ? না না, স্যালো-ট্যালো নয়।

—তবে ?

—রাম সেনের নাম জানেন ? কৃষক নেতা ছিলেন ?

—না, কবে ?

—অনেক আগে।

—তাঁর নামে কি হবে ?

—পুরনো দিনের লোকশিল্পী, গায়ক এঁদেরকে একটা সাহায্য দেবার কথা হচ্ছে। রাম সেন বললেন, রামলাল খাটুয়া বিরগেড়িয়াতে থাকতেন।

—বিরগেড়িয়া ? নয়াবসত বলুন।

—তা তো আমি জানি না। এ-কথাও বললেন যে, গজানন বেরা তাঁর খোঁজ দিতে পারেন। আপনারা জানেন ? আমার শুধু ওঁর খোঁজটা দরকার—

—নয়াবসতে তো ও নামে কেউ নেই।

—গজাননবাবুও তাই বলছে।

কৃষক বা কৃষক নয় ভানু সান্না বলে, আরে, সেই যে সেবারে গান করেছিল…বেলদায় আনা হল…সেই যে ছয় বছর আগে…সে তো কবে চলে গেছে অন্য থানায়। রামলাল খাটুয়া!

মোপেড বলে, বুঝেছি। বেয়াল্লিশে জেলে গেছল, নয়? বাবা বলত বটে।

—কোথায় গেছেন, আপনার বাবা জানবেন?

—মুণ্ডারা জানবে। ওরাই গিয়ে এনেছিল।

দশরথ আগ্রহী খুব, কত পাবে?

—তা কি বলা যায়?

—যা হোক, পঞ্চায়েতের জানা দরকার।

—নিশ্চয় জানবেন।

দশরথ বলে, যা হোক! আমাদের না জানলে…এখন তো সব নানা ধান্দায় নানা লোক আসে। আমাদের বি ডি ও চঞ্চল সরকারও বললেন…

সোমের স্মৃতিতে ঘা লাগে। চঞ্চল…বর্ধমানে বাড়ি…

—চঞ্চল সরকার? বয়স কত হবে? আমার মতো? বছর আটত্রিশ হবে?

—তাই।

—খুব কোঁকড়া চুল? লম্বা? কপালে জরুল আছে? একটু তোৎলা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ

—সে আমার সহপাঠী ছিল। কোথায়? দেখা করা যায়?

—বেলদায়, আবার কোথায়?

—কাল দেখা করতে হচ্ছে। কেমন কাজ করছে, ভালো?

—ভালোই। আমাদের কথা শোনেন।

—ওকে বলবেন, সোম চৌধুরী।

মোপেডের সন্দেহ যায় না। সে বলে, এসব খোঁজ আমাদের কাছে করবে সরকার।

দশরথ বলে, দূর! শুনছ অন্য থানা!

মোপেড বলে, চললাম। কাল তাহলে বেলদা যাচ্ছেন একবার?

—সে তো বটেই।

—ওনার সঙ্গে তো সুনন্দকুমারও পড়ত, তাই না? ওই যে ফ্লিম করে?

…হ্যাঁ হ্যাঁ, সে-ও পড়তো। ওর আসল নাম ছিল 'অজিত'। কিন্তু সিনেমায় নাম হল

—আপনার সঙ্গে দেখা হয়?

জয়ির বাড়িতেই সুনন্দ ফ্ল্যাট কিনেছে। অতএব সোম স্বচ্ছন্দে বলতে পারে হরদম দেখা হয়।

মোপেডের মুখ থেকে বিদ্বেষ ও সংশয় মুছে যায়। গভীর আগ্রহে ও বলে, আচ্ছা! উনি কি বম্বে চলে যাচ্ছেন?

সোম কোনো খবরই রাখে না, তবুও সান্ত্বনা দেয়, গেলেও ছবি করে চলে আসবে।

—কলকাতায় পড়লে কত রকম ফিল্ড! বিনোদমাধব স্কুল আর মেদিনীপুর কলেজে পড়লে কি কোন স্কোপ মেলে? খুব ইচ্ছে ছিল ফ্লিমে নামব। আচ্ছা…নমস্কার…গজাননের সব কথা বিশ্বাস করবেন না। ও বেজায় ফালতু বকে। আপনার মতো লোক…কি খাওয়াচ্ছে…কি করছে…

ভানু সান্না বলে, তা ও কি করবে? বউ থাকলে তবু…সে তো বাপের বাড়ি।

দশরথ বলে—ওসব কথায় দরকার কি! কার বউ কোথায় গেছে…

ওরা চলে যায়। টর্চ জ্বেলে সোম একটি চিমনিফাটা লণ্ঠন যোগাড় করে। সেটি জ্বেলে নেয়। যাবার সময়ে মোপেড বলে,

গজানেনর দরজা দেখেছেন? হাতিও ভাঙতে পারবে না। ঘরে আছেটা কি?

দশরথের উত্তর শোনা যায়, পাকা শালকাঠ হে! ওর বাপ করে রেখে গেছল তাতেই···এখন অমন কাঠ পাবে? সে সময়ে···

ওরা চলে যায়। গজানন ঢোকে। সঙ্গে কালীপদ সিং মুণ্ডা।

কালীপদ বলে, গেছে?

—হ্যাঁ।

—আপনি কিছু বলেননি তো—

—যা সত্যি তাই বলেছি। আপনাদের বি ডি ও বোধ হয় আমার সহপাঠী। দেখা করে যাব কাল।

কালীপদ বলে, সমর হল এখানকার বাপ। যদি কেউ আমাদের কাছে এল···ছেলেগুলো চটে যায়। বলি, চটিস না বাপ! দিন যেমন, তেমন চলতে হবে।

গজানন চাটাই পাতে। কালীপদ বিড়ি ধরায়। বলে আপনি রামলাল খাটুয়ার খোঁজ করছেন, তাই না? বেরা তাই বলল।

—হ্যাঁ।

—রামলাল খাটুয়া!

—চেনেন?

—চিনব না কেন? খুব চিনি। তার বাঁধা গান আমরা বাধনা, বাহা, করম পরবে গাই। আগের মতো নেই কিছু। তেমন করে পরব হয় না···

—সত্যি ওকে চেনেন?

—আরে, আমার ঘর তো বিরগেড়িয়াতেই ছিল। ছাড়তে হল যখন, তখন সব ছিটাভিটা···সে বলে যে তার কারণেই তোদের এমন হল। তাদের সঙ্গেই যাই, হেথা থাকব না।

—এ গ্রামে এলেন?

—না। আমরা দু'ঘর এলাম। কেউ গেল গামা, কেউ গেল

নারমা, তা তিরিশ ঘর গেল সেই শাঁকরাইল থানা, সেই শালবনী-আক্কেরী।

—শালবনী?

—শালবনী এ জেলায় অনেক পাবেন। শালও নাই বনও নাই, নামে নামে যা আছে।

—তাঁকে চাই যে?

—বাবু! কেচাবেচা বিস্তার। আবার খড়গপুর যাব। সেথা থেকে কেশিয়াড়ির বাসে হাতিগেড়িয়া। তা বাদে রোহিণীর বাসে চেপে মদনপুরে নামব। তা বাদে দক্ষিণে হাঁটব।

—কত সময় লাগবে?

—একটা দিন লেগে যাবে। বিকেল-সাঁঝে পৌঁছাব। কষ্ট হবে।

গজানন বলে, কালীপদ বহুত চালু লোক। ও আপনাকে কোন কষ্ট দেবে না। সর্বত্র ওর স্বজাতি যত, তাদের সঙ্গে ওর খাতির তত।

কালীপদ বলে, আমার বয়স কত বলুন তো? দেখে বোঝেন?

—আমার আগেই কথাটা বলা উচিত ছিল, অন্যায় হয়ে গেছে। আপনারা আমাকে 'আপনি,' 'বাবু' বলবেন না। আমি সব দিকেই আপনাদের চেয়ে ছোট।

—তা বলতে গেলে···মানুষ জানলে আবার কি ভাববে কে জানে।

কালীপদ বলে, কথা ঠিক। বাবু বলব কেন, আপনি বলব কেন, কার ভয়ে? আর কত ভয় করব বেরা?

—বিরগেড়িয়া থেকে উচ্ছেদ হলেন···

—সে লোক তো পাগল ছিল, নয়?

—ভোলানাথ দত্ত বলেছেন···

—বাপ রে? শূরবীর মানুষ ছিল।

—ওঁর কথা শুনবেন?

—কেমন করে।

—আমি শোনাব। তবে সময় লাগবে অনেক।

—কালীপদ আবার রাতকানা।

—শোনেন তো আমি এগিয়ে দেব।

টর্চ জ্বেলে, ক্যাসেটের বাক্সের গায়ে নম্বর দেখে, সোম সেটি চালায়। টেপ করার সঙ্গে সঙ্গে নম্বর ও বিষয় লিখে না রাখলে খুঁজে বের করা মুশকিল।

"বিরগেরিয়া, নারায়ণগড়ে বহু জায়গাতেই তখন শাল, সিধা, নানা গাছের জঙ্গল…"

কালীপদ ও গজেন যেন পাথরের মত নিশ্চল হয়ে যায়। সোম বলে, আপনারা শুনুন, আমি চা করি। মন দিয়ে শুনুন।

কাঠকুটোর যোগাড় আছে, সব গোছানো। ভুষোমাখা, কানা-ভাঙা অ্যালুমিনিয়ামের পাতলা হাঁড়িতে ও চা করে। ওদেব সামনে রাখে। চায়ের দোকানের মতো ছোট ছোট গেলাস কাচের।

ওরা মন্ত্রমুগ্ধ। রামলালের কথা "না, তেভাগা! এক ভাগ আমরা, দু'ভাগ ওদের। কেউ না জানুক, এখানেই তেভাগা হোক।"

এখানেই সোম সুইচ বন্ধ করল। কালীপদর মুখ নীচু। ও যখন মুখ তুলল, ওর চোখে জল। গজানন গালে হাত রেখে বসে আছে।

কালীপদ গলা পরিষ্কার করে, তোমার বয়স কম! তবু তোমায় পরণাম করি। কতকাল পরে…

কালীপদ বলে, গম্ভীরা সিং…নাই! শুক্রার মা! নাই। ছেলে ছেলে বলে…

—শুক্রাও নেই?

—না, নেই। ওই তেভাগার কারণে…জমিদারদের ভয় উঠে গেল খুব। আমাদের উচ্ছেদ করতে থাকল…নতুন রায়ত বন্দোবস্ত… মোটা সেলামী…রামলালের উপর হামলা ..আজ তুমি দিচ্ছ, কাল আমরা দেব? আর পাগল হয়ে যেয়ে গাছ কেটে কাঠও বেচে… জমিও…আমরা শুনছি জমিদারী উঠে যাচ্ছে · কোথায়!

—তারপর ?

—আমরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকলাম · জান দেব তো জমি দেব না···মারদাঙ্গা ··ঘরে আগুন। আমরা তীরধনুক তুলে ছুটলাম··· পুলিশ এল···গুলি চলল···গম্ভীরা গেল, শুক্রা গেল, আমার দাদা গেল···আমরা···উচ্ছেদ···হলাম।

—রামলাল ?

—তাঁকে জমিদার থাকতে বলেছিল···সে বলল, ওরা নাই তো আমিও নাই। আমার কারণে···বেরা ! এ কি জিনিস শুনলাম ! তোমার নাম কি যেন বলল গজানন ?

—সোম, সোমনাথ।

—সোমনাথ ! তোমাকে আমি নিয়ে যাব। ওঃ, বিরগেড়িয়ার, সকল সাঁওতাল মুণ্ডা যদি শুনত, তারা আজ···কেউ বলে না···কেউ জানে না···ভোলানাথবাবু এখন কি করে ?

—গাছ লাগায়। মানুষকে দিয়ে জোর করে গাছ লাগায়।

—সেখানে গাছ ছিল না ?

—না।

—এখানে ছিল। নাই। আমাদের গড়াম দেবতা বলতে যা একটা শাল গাছ ! কাল আমি তোমাকে নিয়ে যাব। রামলালকে দেখাও হবে। সে লোক···যেয়ে দেখো।

গজানন বলে, ব্যাটারি আছে ? দাও। আমি ওকে নিয়ে যাই। আজ কৃপাবাবু থাকলে···মতীশ জানা থাকলে···

ওরা চলে যায়। সোমকে ঘিরে রাতের প্রথম প্রহর নামে।

গজানন ফিরে আসে। বলে, কানতে কানতে গেল। চোখ হতে শুধু জল · ভাত বসাই।

—যা আছে, ভাগে জোখে হবে না ?

—ওটা জল ঢেলে রেখেছি, সকালে খেও। এসেছ যখন···

—চালে ডালে চাপান।

ভাত চড়িয়ে গজানন দরজা বন্ধ করে উনোনের সামনে বসে, যেন

নিজেকেই বলে, গরু নেই। তিনটা ছাগল চুরি হতে বাকি চারটে বেচে দিয়েছি। জমি তিন বিঘা, পাঁচটা পেট। সে জমিতে বর্গা। খড়টা পাই। ধান তো···ওরা যা দেবে তাই নিতে হবে।

নিঃশ্বাস ফেলে, আর জমির ধারেও যাই না। কেন যাব? ওই মজুর খেটে···মাদুর বুনে···স্যালোটা দিল না···বউও মাদুর বোনে। মহাজনই পাইকার। ছ'টাকায় বেচি, সে চালান দেয়।

—মহাজন কে?

—দশরথ মাইতি।

খাওয়া হয়। সব বাসন ঘরে তোলা হয়। চাটিবাটি চুরির দিন এখন। ঘরের দরজা বন্ধ করে। দুটো মাচাং, একটা চৌকি। সোম চৌকিতে শোয়।

—আশ্চর্য, মশা নেই তো?

—না, তা নেই। নালা-নর্দমা থাকলে থাকত।

—বিবগেড়িয়ায় সে নদীটা আছে?

—হয়তো আছে। আমি তো নয়াবসত যাই না। সে এখন মস্ত গ্রাম।

—কৃপাসিন্ধুবাবুর বাড়ি?

—উনি মরতেই সব বেচে দিয়ে চলে গেল···

—ঘুমাও। কালীপদ ঠিক কাকভোরে আসবে। আমাদেব যা অভ্যেস! ক'টা বাজল?

—ন'টা।

—বাপ রে! এত রাত?

শুয়েই গজানন নাক ডাকায়। সোম মনে করতে চেষ্টা করে, ভোলানাথ দত্ত কেমন মগনাদি, কেমন বেলদা দেখেছিলেন।

মনে করতে পারে না! কলকাতার চেহারাই যে শুধু পালটাচ্ছে তা নয়, গ্রামবাংলার চেহারাও বদলে যাচ্ছে।

সকালে কালীপদ কাকভোরেই আসে। মাঠে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য

সারা, বাঁধে স্নান করা, চা ও পান্তা পরপর খাওয়া, বেরোতে দেরিই হয়।

আবার নিমাইয়ের রিকশা। গজানন বলে, আবার এসো। ভুলে থেকো না।

—আসব তো বটেই।

একই পথে ফেরা বেলদায়। সোম বি ডি ও-র কোয়ার্টারে যায়। হ্যাঁ, সেই চঞ্চল!

সোমকে দেখে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে এবং সোম এখনি চলে যাবে জেনে দুঃখ পায়। জীপ বিকল। নইলে ওই সোমকে পৌঁছে দিত খড়গপুর।

—এখানে হঠাৎ?

সোম সবই খুলে বলে। চঞ্চল শুনে যায়। বলে, পরের বার এখানেই উঠো।

—নিশ্চয়।

—গৃহিণী কলকাতায়। ছেলেদের স্কুল!

—ভালই তো। বর্ধমানে বাড়ি ছিল না তোমার?

—তা আছে। আমি কলকাতাতেই নাকতলায় একটা…ওই আর কি, চারখানা ঘর…

—ভালই আছ।

—তোমার মত কি আর? তোমার স্ত্রী—

—হ্যাঁ।

—লাকি ম্যান।

—বলতে পারো।

—ছেলে মেয়ে?

—নেই। হয়নি।

—যা হোক, সমরদের সঙ্গে কথাবার্তা বেশ ভালভাবে হয়েছে তো?

—তাই তো মনে হল।

চঞ্চল বলে, খুব কাজের ছেলে। চমৎকার! পরে এসো, ব্লকের কাজকর্ম দেখাব।

—নিশ্চয়।

—কোথাও লিখবে না তো?

—না না। চলি চঞ্চল। তুমি সমর প্রধানদের নিশ্চিন্ত কর।

—নিশ্চয়। কলকাতাকে বড় মিস্ করি।

—যাও না?

—তা যাই। তবে ওখানে থাকা তো হয় না। এসব চাকরিতে যে কত ঝামেলা···

কালীপদ বাসস্টপে বলে, বাবুর কলকাতায় ত্নটো বাড়ি, বলে 'একটা'।

হ্যাঁ। প্রশাসনিক বন্দোবস্তীর প্যাটার্নে চঞ্চল নিজেকে সুন্দর মানিয়ে নিয়েছে।

বাস এসে পড়ে।

॥ ৮ ॥

বেলদা থেকে খড়গপুর। তারপর 'ডিস্‌কো' বাসে গাদা বোঝাই হয়ে হাতিগেড়িয়া। হাতিগেড়িয়াতে নামতে দেখা যায় কালীপদর জনসংযোগ বিস্তার।

—এখানে তবু গাছপালা আছে।

—এখান হতে নয়াগ্রাম অবধি···

—আছে?

—না না, আর থাকে? দাঁড়াও, জিগ্যেস করে আসি।

দোকানে জিজ্ঞেস করে কালীপদ। না, খবর সুবিধের নয়। রোহিণীর বাস যাবে কিনা বলা যাচ্ছে না এখন, সব অনিশ্চিত।

—কেন?

—মদনের বাস বাছুর চাপা দিয়েছে। মদনকে খুব মেরেছে পাবলিক। ফলে ও পথে বাস চলছে না অনেকক্ষণ।

—মদন মানেই গণ্ডগোল।

—যা বলেছ।

—এখন উপায়?

—শালবনী, না রোহিণী?

—শালবনী।

—হেঁটে যাও।

—না বাবু, ইনি পারবে তো আমি পারব না। আল ভাঙব, নালা পেরাব, উঁচু ডাঙায় উঠব···পৌঁছাতে সন্ধে পেরাবে, রাত হবে।

সোম বলে, চলুন না।

—না না, কৃষ্ণপক্ষের রাত!

—তাহলে?

—আমরা কি জলে পড়েছি?

কালীপদ ওর অভিভাবক এখন। রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে ও একটি বাড়ির সামনে ডাকাডাকি করে, ধনঞ্জয় কোথা হে, ধনঞ্জয়?

একটি প্রৌঢ় সাঁওতাল বেরিয়ে আসে।

—কে? খালিপদ কালীপদ?

—নয় তো কে? এসো সোমনাথ।

—ইনি?

—ইনি সোমনাথ। ইনি ধনঞ্জয় টুডু। দেখছ পেট মোটা। কিন্তু ধমসা নিয়ে নাচবে যখন···

—ভিতরে এসো।

কালীপদ জুতো বা চটি পরে না। সে জন্যেই ওর নাম বোধ হয় খালিপদ কালীপদ।

—বসুন, তারপর?

—ইনি শালবনী যাবে।

—তোমার বেয়াই বাড়ি?

—না হে, রামলাল খাটুয়ার কাছে।

—আজ তো যাওয়া হয় না। বাস চলবে না। কালও চলে কি না! বাস তো পথেই পড়ে আছে।

—কাল ভোরে যাব।

—ইনি হাঁটতে পারবে?

—খুব পারবে। দেখ সোমনাথ! বিরগেড়িয়া থেকে এবাও এসেছিল। অনিলের মনে থাকবে না।

—কেন থাকবে না? আমি কি তুমি?

—ও, সেই কথা।

—দেখেন একে। এই বুড়ো আমার মেয়ে জান্তিমণিকে ছোটবেলা বলত, আমি তোকে বিয়ে করব।

দুজনেই হাসে।

—সে আছে কেমন?

—ভালই আছে। না, মেয়ের বিয়ে ভালই দিয়েছি। আমিও মাস্টার প্রাথমিক স্কুলে, সে-ও তাই। গ্রামটাও ভাল। গ্রামসমিতি আছে, সেখানে আমার মেয়ে কাজও করে। অবশ্য নয়াগ্রাম থানা। খানিক দূর পড়ে।

—তাহলে?

—এখানে কি আগে থাকনি?

—সেই তো কথা। তোমার ঘর থাকতে সিংগাই বা লেংগামারা যাব কেন?

—চলো, পা ধোও জল খাও।

পা ধোয়া এক অনুষ্ঠান। ধনঞ্জয়ের বউ একটি মেয়েকে ডাকে। কালীপদ নির্দেশ দেয়।

—ওই পিঁড়িতে দাঁড়াও, প্যাণ্ট গোটাও।

মেয়েটি হাঁটু থেকে পা ধোওয়ায় দুজনকে, পা মোছায়। তারপর দু গেলাস জল আনে।

—আইবুড়ো মেয়ে পা ধোয়ালে, জল খেলেন, এবারে আপনি গেরস্তের দাওয়ায় উঠবেন।

—আমাকে 'আপনি' বলবেন না।

—আমরা তো 'তুই' বিনে বলতাম না। তবে আপনাদের মধ্যে বসবাস, শিখতে হয়েছে। এখন তো আদিবাসী হোক না হোক, অচেনা দেখলেই 'আপনি' বলি।

কালীপদ বলে, শাশুড়ি, চা খাব গো!

—এনেছি।

চা, মুড়ি, ঠাণ্ডা শক্ত দরবেশ। ধনঞ্জয় বলে, হাওয়া খুব ঘুরছে হে, জানলে?

—কি রকম?

—কেশিয়াড়িতে গরিব সাওতালদের পার্টির ধনী লোকেরাই খুব অত্যাচার করল। তারা তো হাতে করে না, অন্যদের দিয়ে··· আমাদের স্বজাতিও ছিল···

—তারপর?

-অনেক চলল। এখন থেমেছে। তবে কেশিয়াড়ির সাওতালরাও খানিক দাবী আদায় করেছে।

—তুমি এখন কি?

—আমি ভাই কোন দলে যাই না। যেটুকু কাজ করবার, করি।

—সমিতি করছ?

—যতটা পারি, করি। আর তো জান···

—ধনঞ্জয় যাত্রার পালা লেখে।

—বাংলায়?

—আমাদের ভাষায়।

—যাত্রা দল?

—আমাদের আছে, কালীপদের আছে, যার যার ভাষায়··

—কেমন পালা হয়?

—নানা রকম। তবে সিধু-কানুর পালা এখন নানাদিকে চলছে। এদিকে আমার পালাটাই···

কালীপদ বলে, খাটুয়া এখনো গান লিখে?

—বললেই গান বেঁধে দেয়।

—আপনার পালার জন্যে ?

—মাঝে মাঝে। যা বলে, তাও তো ঠিক। আমি বাঁধব, সেটা তোরা তোদের ভাষায় আবার···যা না তোদের বুড়াদের কাছে। সিধু কানুকে নিয়ে কত গান তারা আজও মনে রেখেছে, আন্ গা !

—সে নিজেও বা কত যোগাড় করছে।

—আপনাদের পালাপরবে এখনো গান বাঁধেন ?

—হ্যাঁ···তাকে না হলে চলে না। আমরা আমাদের গান গাইব, সে তার গান গাইবে···

কালীপদ সগর্বে বলল, সেবার আমরা বীরসা ভগবান দিবস করলাম, তাকে মান দিলাম।

সোমের মনে হয়, একটি কথা, 'এখানে তেভাগা হোক'। এক গ্রামীণ কবি, কোন একদিন ভোলানাথ দত্তদের শ্রদ্ধা করেছিল, মূল আঁকড়ে সে পড়েই ছিল, আজও আছে। যেন কোথাও, তথাকথিত সভ্য সমাজের চোখের আড়ালে এক প্রাচীন বনস্পতি, একটি বিশাল গাছ আকাশে মাথা তুলে রেখেছে, ছায়া দিয়ে যাচ্ছে, ফল ও বীজ থেকে নতুন গাছের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে, দিয়েই যাচ্ছে।

—ওঁর চলে কি করে ?

—সকলের মতো ওরও বিঘা দুই-তিন—

—তেভাগা করছেন ?

কালীপদ নিঃশ্বাস ফেলে, হ্যাঁ। সে লোক তো চাষ করে না। মলেন, নাকফুড়ি, আমাদের স্বজাতিরা···সে সময়ে তেভাগা করার জন্যে কত লাঞ্ছনা···এখন তা নাই, ওই চলছে।

ধনঞ্জয় বলে, খাটুয়ার ছেলেটা···

—বিয়ে করেছিলেন ?

কালীপদ বলে, হ্যাঁ গো। সেই বিরগেড়িয়াতেই। মাহাতোদের ঘরে একটা ভাতুয়া মেয়ে ছিল ··আদিবাসী নয়···কোন্ বা জাতি··· তাকেই। বিরগেড়িয়া সে যখন ছাড়ল, সেও চলে এল না ?

ধনঞ্জয় বলে, তাঁতি জাতি···চাণ্ডিলের···ওখানে···খুব কর্মবীর মেয়েছেলে।

—ছেলেমেয়ে ?

—ওই একটা ছেলে ···সে খড়্গপুরেই থাকে. রেলে কাজ করে, আসে না, আসবেও না।

কালীপদ বলে, সব সুখ মানুষের হয় না।

ধনঞ্জয় নিঃশ্বাস ফেলে বলে, ছেলেটা লাফাঙ্গা।

কালীপদ বলে, তা নয়। ছেলেকে তাতাল তোদের জমিতে নূতন বর্গা বসা, ওরাদের নাম কেটে দেই, সে খাটুয়া হতে দেয়নি।

—সে হতেই বাপ-ছেলেব বিবাদ। তা ছেলে তো ওয়ার্কশপে কাজ করে, কোয়ার্টারে থাকে, বিয়েও করেছে। সে আর আসবে না।

—ছেলের মা যেত আসত। তবে এখন ছেলের বউ হয়েছে। আর তেমন যায় না। ধনঞ্জয়ের বাড়িতে রাত্রিবাস। রামলাল এখন অনেক কাছে। জান্তিমণির মা কত যত্ন করে ভাত বেড়ে দেয়। আরো খাও। ভাত মেখে নাও। ও কি আহার ? থাকো ছুদিন। হাট হতে মাছ আনব।

ধনঞ্জয় বলে, উনি খাটুয়ার কাছে যাবে।

—সকালে খেয়ে যাবে তো ?

কালীপদ বলে, না গো শাশুড়ি। ভোর ভোর না বেরোলে, এখানে চারদিকে চেনাজানা···যে দেখবে সেই কথা উঠাবে এস, একদিন থাকো। আমি রাতকানা···

সোম বলে, চোখটা দেখিয়ে নেবেন। ওটা তো অসুখ একটা, চিকিৎসা হয়।

—এ ঘরে ঘরে। চিকিৎসা হয়···ওষুধ আছে···আমাদের জন্য নাই।

—কখনো কলকাতা এলে আমি দেখিয়ে দেব।

ধনঞ্জয় বলে, ওরও দোষ আছে। খড়্গপুর যেতেই পারে। মানুষ যাচ্ছেও।

—বাবা! অনেক দূর।

—তুমি তো জামাই; হেঁটেই যাও। খুব হাঁটতে পারে। আমরা অমন পারি না।

ধনঞ্জয়ের ট্রানজিস্টার আছে, সাইকেল। কয়েকটি মুরগি, ছাগল, পাশের ঘরে কিছু ধান। আর কয়েকটি বই। ধনঞ্জয় বলে, আমাদের ভাষায়···যা যেখানে পাই···

কালীপদ বলে, কাল তুমিও চল না কেন?

—স্কুল আছে···তা ছাড়া অতুলের বাড়ি একবার যেতে হবে। ল্যাম্পের কাজকর্ম ঠিক মত করে না। এখানে জানেন? এখনো কিছু বিড়িপাতা···মানে কেন্দু-জঙ্গল আছে··ভাল বুঝে পাতা তুলবার, দাম দেবার কাজ তাকে দিলাম পাঁচজনা। তা, তার কোন মনই নাই।

কালীপদ বলে, যার মন দেখবে তাকে দিবে।

—সে তো আমার কথায় হবে না ভাই।

—আপনারা যখন আসেন তখন এসব জায়গা?

—শুনেছি সরকারের ছিল, বুঝি ফরেস্টের···বন তখন অনেক। আমরা বসত বসে গেলাম। যা হোক এখন আর উচ্ছেদের ভয় নেই।

—তবু কি শান্তি আছে?

—শান্তি আজ কোথায় ভাই? ওরই মধ্যে···

জান্তিমণির মা বলে, একটা দিন যায়, বলি এ দিনটা এভাবে গেল, যাক! তাতেই শান্তি। জামাই তো আমাদের মেয়ে এনেছিল। কে কি কাগজ ছড়াল, যে তিন দিনের মধ্যে সব ধ্বংস হবে, যেয়ে শনিঠাকুরের পূজা দাও, যে যার গরু ছাগল বেচে দাও!

কালীপদ হাসে।

—ভাগ্যে শুনি নাই।

—না না, তখন আমিও নাচলাম···কয়েক ছোঁড়া শনিঠাকুর প্রতিষ্ঠা করবে বলে···

—করেছে?

—এসব জায়গায় সুবিধা হল না। খড়গপুরে খুব জমেছে এখন।

কালীপদ বলে, অনেক কাল আগে নাকি কলকাতায় চেত্তাবনী উঠেছিল, সব ধ্বংস হবে। গম্ভীরা সিং বলত, আমরা জানি, সাঁওতালরা জানে, একবার ঠাকুর পৃথিবী সির্জাল, সে পৃথিবী পাপে ভরে গেল, তখন আগুন ঢালল, যার নাম সেংগেলদা···সব জ্বলে গেল···আবার জল ঢেলে আবার সির্জাল···তা ধনঞ্জয়! একদিন তো তা আবার হবে? সোমনাথ কি বল?

সোম ঈষৎ হেসে বলে, হবে কি? পৃথিবী এখন পাপ সয়ে সয়ে···

—এখানে?

—সর্বত্র। এত যুদ্ধ। এত কিছু, এত দুর্নীতি···সেংগেলদা কি আবার হবে?

কালীপদ আদিম বিশ্বাসে বলে, হবে না বলেই দেখে মনে হয়, কিন্তু গম্ভীরা বলে গেছে পাপের ভরা ভারি হলে তবে সিধু কানু এসেছিল বীরসা ভগবান

ধনঞ্জয় বলে, ছাড়ো তো। মহৎ মানুষ ছিল ওরা, দিন ছিল অন্যরকম। এখন!

সোম শুনে যায়। আগে যা হয়ে গেছে, এখন তা তেমন করে আর হবে না! পরিবর্তিত সময়, রাজনীতি, মানুষ, ভূগোল, পরিস্থিতি, না, আর কোন আদিদেবতা পৃথিবীকে 'সির্জন' করে, পাপদগ্ধ পৃথিবীকে পুড়িয়ে বর্ষণে ভাসাবেন না। কেঁচোর পেটের মাটি স গ্রহ করে আবার পৃথিবী গড়বেন না। আদিম হংসমিথুন সৃষ্টি করবে না মানবসমাজ। কালীপদ যা বলছে, ও জানে তা হবার নয়, তবুও বিশ্বাস করতে চাইছে। ধনঞ্জয় যা বলছে, ওর বিশ্বাস ও অবিশ্বাস কোথাও শেষ হচ্ছে।

না, ওদের ত্রাতা ও পাতা সিধু কানু বা বীরসা আবার ঠিক তেমন ভাবে সম্ভব নয়। অরণ্যের অধিকার ও অরণ্য-জননীর সন্তানদের মধ্যে ব্যবধান তুলেছিল সেদিন জমিদার, মহাজন, ব্রিটিশ সরকার। অনেক সরল ছিল নকশা।

বিয়াল্লিশে পুরুলিয়াতে খেড়িয়া-শবররাও আন্দোলনে নামে, জেল খাটে, গোপেনবাবু তাদের রাজনীতিক পেনশনের জন্যে চেষ্টা করে··· জানা যায়, খেড়িয়ারা অপরাধপ্রবণ জাতি···থানা দখল···ঝাণ্ডা

ওড়ানো···সেসব কারণে জেল খাটার রেকর্ডও পালটে যায় কোথায় যেন, কাদের যেন ঔদাসীন্যে? ক্রমেই জটিল হয় নকশা।

আর তেভাগা! জান দেব তো ধান দেব না। কাকদ্বীপ ষড়যন্ত্র মামলার পর কোন জঙ্গী কর্মীর বউ পথের পাশে ভিক্ষে করে···ভোলানাথ দত্তরা কেন এক সময়ে সব ছেড়ে চলে যায়?

আর আজ তো দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত মানুষ এবং তার মানুষের অধিকারের মাঝখানে বহু প্ল্যান, বহু স্কীম, বহু ব্যবস্থা, বহু স্বার্থ।

তেমন করে আর কিছুই হবার নয়। তবে কেমন করে? সেসব কথা কারা ভাববে?

এর মধ্যে সোম কোথায়? এই সুবিশাল বন্দোবস্তীতে? কে কোথায় বিষাক্ত মাকড়সার জালের বাইরে ধুলো মুঠো নিয়ে তবু বেচে আছে তাদের সন্ধান করবে? জয়িকে কিছুই বোঝানো যাবে না।

সোম জানে না সে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে কাকভোরে কালীপদ ওকে ডাকে। ধনঞ্জয় বলে, ওই টেপ আমরা শুনব না?

—কোথায়?

—শালবনীতে। সকলের সামনে।

চা খায় ওরা, মুড়ি ও ডিম ভাজা। জান্তিমণির মা বলে, আবার আসবে, থাকবে, কেমন?

—নিশ্চয় আসব।

যত জায়গায় 'আসব' বলেছে, সব জায়গায় ফিরে ফিরে যাবে ও, যেতেই হবে। নইলে তার মুক্তি কোথায়?

লেঙ্গামারা স্টপের উল্টো মুখের পথ। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় কালীপদ বলে, দক্ষিণে ঘুর গো।

দক্ষিণের পথ ধরে খানিক, তারপর দক্ষিণ-পশ্চিমে শুধু আল ভেঙে চলা, শুধু আল। জমি ক্রমশ উঁচু হয়। একটি সুউচ্চ পাড়ের নিচ দিয়ে জল বহে যায়। হাঁটু ভিজিয়ে সে জল পেরিয়ে পাড়ে ওঠা। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিমে হাঁটো, আরো হাঁটো। ক্রমে সার সার ঘর দেখা যায় গাছ, সবজির ক্ষেত।

কালীপদ উত্তেজনায় আগে আগে হাঁটে, কই! কোথায় রে তোরা? আমি কালীপদ হই হে, অতিথি নিয়ে এসেছি।

এ-ঘর ও-ঘর থেকে দৌড়ে দৌড়ে আসে মানুষ। কালীপদ এখন পরিস্থিতির নেতা।

—সকল কথা পরে। আগে বলো খাটুয়া কোথা? সে ঘরে আছে?

—ওই তো ঘর।

—ওই তো খাটুয়ার বউ।

—খাটুয়ানী গো! সে কোথায়?

বছর পঞ্চাশ বয়সের একটি শক্ত চেহারা মহিলা, দেয়ালে ঘুঁটে দিতে দিতে ঘুরে তাকায়। খাটো পারা ডুরে কাপড় কপালে সিঁদুর। মাহাতোদের খাতুয়া ছিল…তাকেই!

খাটুয়ানী সপ্রশ্ন চোখে তাকায়, কি, দেওর?

—খাটুয়া কোথায়?

—হোই পাড়ে। ছাগল নিয়ে গেল।

ওরা চলে, একজনে দু'জনে ভিড় বাড়ে।

সুউচ্চ পাড় যেখানে শেষ, যার পর আকাশ, সেখানে সাঁইবাবলা ও পলাশ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কয়েকটি মানুষ।

—খাটুয়া দাদা গো!

লোকটি স্মিত মুখে ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। বয়স এখন সাতষট্টি, রোদে জলে পাকানো চেহারা, রং একদা ফর্সা ছিল, এখন পোড়া, খাটো ধুতি পরনে, হাতে একটি ছোট লাঠি। কালীপদ উত্তেজিত, এস হে!

সোম বলে, থাক। আমি যাচ্ছি।

সোম পাড় ভেঙে ওঠে। বুকের ভিতরে কি যেন ধাক্কা দিচ্ছে, যেন বন্যা ঢেকে দিচ্ছে মাটির তৃষ্ণা। যেন বৃষ্টি পড়ছে কোথাও।

—আপনি…গণ-কবিয়াল রামলাল খাটুয়া?

—আজ্ঞা।

সোম ওর দিকে তাকিয়ে থেকেই কাঁধের ব্যাগ হাতড়ায়, বইটি বের করে, ওর হাতে দেয়।

—'গণ-কবিয়াল রামলাল খাটুয়ার 'সংগীত সংগ্রহ'…গণ-কবিয়াল…

—ভোলানাথ দত্ত দিয়েছেন।

—ভোলাবাবু!

—হ্যাঁ···টেপ রেকর্ডার এনেছি · সব আপনাকে শোনাব··· এঁদেরও···

রামলাল ধুতিতে হাত মুছে বইটি উল্টাতে থাকে, ওর হাত কাঁপছে, এই তো! এই তো সকল গান হে! মলেন রে! নাকফুড়ি রে! বিবগেড়িয়ার সকল জন হে! ভোলাবাবু বই পাঠিয়েছে···সব গান এখানে ধরা আছে···যা দিয়েছিলাম।

উল্টে যায় ও, পাতার পর পাতা, দৌড়ে দৌড়ে নেমে আসে, তেভাগার গান হে, তেভাগার গান!

সোমকে জড়িয়ে ধরে ও, কেঁদে ফেলে। তারপব দুজনে দুজনেব দিকে তাকিয়ে থাকে।

—কোনো গান···এ গানটা·· মনে আছে?

রামলাল আনন্দে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। যেন আহ্বান জানায়, সজোরে, মনে আছে! মনে আছে! আমার মাটিতে তেভাগা। আমার মনে থাকবে না?

বলে ও দু হাত ছড়িয়ে আকাশ পানে মুখ তুলে চোখ বুজে, মুখে হাসি মেখে, পুরনো দিনের গলায় গেয়ে ওঠে,

অ শহীদের মা!
শহীদেব মা!
হাজার সন্তান আছে
তুমি কেন্দ না···

গানে সব ধুয়ে যায়, কালীপদরা উঠে আসে। যাকে পায় তাকে জড়িয়ে ধরে রামলাল, বলি নাই তোদের? বলি নাই।

মলেন সযত্নে ওর হাত ধরে নামায়। বলেছ হে খাটুয়া, সকলি বলেছ, এখন গ্রামে চল কেন? ধমসা মাদল বাজাবে, তোমার গান হবে·

কালীপদ বলে, ভোলাবাবুর গলা শুনতে আছে···

ওরা জড়াজড়ি করে নামে। রামলাল, কালীপদ, ওরা সোমকে শক্ত করে ধরে রাখে, তার কোন দরকার নেই, কেননা সোম এখন এ রকম পাড়ে উঠতে, ঘাসের ঢাল বেয়ে নামতে নিজেই পারবে। চটি খুলে নেয় ও। এসব ঘাস মাটি, এসব এখনো বন্দোবস্তীর বাইরে, খালি পা ঘাসে ডোবাও, জানতে পারবে। মাটিতে পা বেখে চলো, হারিয়ে যাওয়া নিজেকেও একটু একটু করে কণায় কণায় ফিরে পাবে।

বাতাস নয়, রোদ বাড়ে, গ্রামের গলিতে নামতে বাতাস ঠাণ্ডা, ঘন ঘন ঘরের চাল, পথ শীতল।